

সাধক রামমোহন

(৫৩ পৃষ্ঠা)

ভারতীয় সাধক

শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত

ইণ্ডিয়ান প্রেস
এলাহাবাদ
১৯১৪

[মূল্য ৸৹ বারো আনা

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা



এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উৎসর্গ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ। হংস, উ, ১।

আনন্দয়িতা বক্তা রসয়িতা। মৈত্রী, উ, ৬, ৭।

অকামো ধীরো রসেন তৃপ্তঃ। অথর্ব্ব সং, ১০, ৮, ৪৪।

তস্য নো রাস্ব তস্য নো ধেহি তস্য তে ভক্তিবাংসঃ স্যাম।

অথর্ব্ব সং, ৬, ২৯, ৩।

ভগবন্নমস্তেঽস্তু। মৈত্রী, উ, ৪, ১।

সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ। কঠ, উ, ১, ১৬।

গৃহাণ বীর হস্তে। অথর্ব্ব সং ১১, ১, ১০।

স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং

তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ং। অথর্ব্ব সং, ১৮, ১, ৪৮।

নমস্তে ভগবন্ প্রসীদ। নৃসিংহোত্তরতাপনীহ, ৯।

হে ভগবন্, আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, আনন্দদাতা, বক্তা ও রস-সম্পাদয়িতা! আপনি নিষ্কাম, ধ্যানী, ব্রহ্মরসে তৃপ্ত; সেই পরমরসধন আমাদিগকে দান করুন, সেই রসের প্রসাদ আমাদিগের নিকট ধারণ করুন, আমরা যেন সেই পরমরসে ভক্তিমান্ হইতে পারি।

হে ভগবন্, আপনাকে প্রণাম করি। বহুভক্তবাণীময়ী এই বিচিত্র-রূপা রত্নমালা আপনি গ্রহণ করুন। হে বীর্য্যবান্, আপনি স্বহস্তে ইহা গ্রহণ করুন।

ভক্তদের এই বাণীরস সুস্বাদু, এবং ইহা মধুমান্, ইহা আশুশক্তি-শালী এবং ইহা বহুরসোপেত। হে ভগবন্, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন।

উৎসর্গ



যিনি

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, আনন্দদাতা ও প্রেমরসরসিক,

যিনি

নিষ্কাম ধ্যানী ও ভক্তিরসে নিমজ্জিত,

সেই

সর্ব্বজনপূজ্য আচার্য্য ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের

শ্রীচরণে

ভক্তিভরে প্রণত হইয়া

এই ভক্ত বাণী-মালা নিবেদন করিতেছি।

তিনি

প্রসন্ন হস্তে ইহা গ্রহণ করিয়া

আমাকে

আশীর্ব্বাদ করুন।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
৭ই আষাঢ় ১৩২১

পাদপ্রণত
শ্রীশরৎকুমার রায়

নিবেদন

এই গ্রন্থে ছয় জন ভারতীয় সাধুর সাধনজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল। ভক্তমাল, মেকলিফ প্রণীত শিখধর্ম্ম ষষ্ঠখণ্ড, নগেন্দ্রবাবু প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-প্রণীত "কবীর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক আনুকূল্য পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এই গ্রন্থের "বুদ্ধ" মৎপ্রণীত "বুদ্ধের জীবন ও বাণী" হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
১৭ই বৈশাখ ১৩২১

শ্রীশরৎকুমার রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভূমিকা



ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনার মালা যে সূত্রের দ্বারা গ্রথিত, সে সূত্র অবিচ্ছিন্ন নহে। সেই মাল্যসূত্রের মধ্যে চারিটি যুগের মোটা গ্রন্থি পড়িয়াছে—বৈদিক, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং আধুনিক। বৈদিক হইতে বৌদ্ধ পর্ব্বে আসিবার সময় সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন, বৌদ্ধ হইতে মুসলমান পর্ব্বে আসিবার কালে সূত্র অনেক দূর পর্য্যন্ত রীতিমত ছিন্ন। বেদের সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় গ্রন্থের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মনে করেন যে, বেদে বুঝি কেবলি যাগযজ্ঞের কথাই আছে এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে তাহারি ফলাও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সময়ে বৈদিকসমাজে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে ধর্ম্মমত লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ যেমন একদিকে বেদের সারভাগ উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে সকল দেবতার "পরম দৈবত" রূপে বুঝিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞসমন্বিত ক্রিয়াকাণ্ডকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিলেন। বুদ্ধ এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-দ্বন্দ্বের যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি রাজপুত্র। কিন্তু এ সময়কার সূত্র ছিন্ন বলিয়া এ সকল কথাকে প্রমাণ করা অতীব দুরূহ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন মহাযান এবং হীনযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেল এবং উত্তর ভারতবর্ষে শক, হুণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের

প্রভাবে আর্য্য অনার্য্যের ভেদচিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম করিল, তখন দক্ষিণাপথে অনার্য্য দেবদেবীগণ হিন্দুসমাজের মধ্যেই অল্পে অল্পে আসন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময়েও বুদ্ধমূর্ত্তি এবং শিবমূর্ত্তি পাশাপাশি পূজা পাইতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। কবে, কেমন করিয়া বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ এই ত্রিত্ব পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ত্রিত্বে পরিণতি লাভ করিল এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদ শৈবধর্ম্মে রূপান্তর লাভ করিল, তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য। অনার্য্য দেবদেবীদের পুরাণকাহিনীর মধ্যে এবং পূজাপদ্ধতির মধ্যে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার মত বৌদ্ধধর্ম্ম লুক্কায়িত হইল। অনার্য্য দেবতারা তাহাদের সকল প্রকারের অনার্য্যতা লইয়াই আর্য্যসভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা হিন্দু হইয়া গেলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিকুলের বিচার না করিয়া অনার্য্যদিগকেও আলিঙ্গন করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনদশায় অনার্য্যদের দ্বারা বিকৃত হইয়া তাহাদের দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম এমনি মিশিয়া গেল যে, তাহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইল। ক্রমে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণেরাও এই পৌরাণিক ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইলেন। ইহা লইয়া যে বিষাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছিল, তাহা দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হইতেই বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক্ অবশেষে পৌরাণিক ধর্ম্ম যখন দাঁড়াইয়া গেল, তখন সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এবং নূতন এক জাতিতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এই সুদীর্ঘ কালের ভাঙন-গড়নের খেলা যখন চলিতেছিল, তখনই মুসলমানের আগমন। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিচিত্র ইতিহাসের সকল উপকরণ কোথায় পাওয়া যাইবে? এইখানে মস্ত এক ফাঁক।

এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত যথার্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষকে আমরা সমগ্রভাবে চিনি নাই, তাহাকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া জানিয়াছি এবং সেই খণ্ডতাগুলি স্থূলগ্রন্থি দ্বারা কোনমতে জুড়িয়া লইবার চেষ্টা পাইয়াছি। এই ইতিহাসের ধারা কতকটা ফল্গুনদীর ধারার মত—অনেক দূর পর্য্যন্ত জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া হঠাৎ এক এক জায়গায় বালুকার মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। এই বালুকা যিনি খুঁড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ত খণ্ড স্রোত-গুলিকে মিলাইয়া ভারতের সমগ্র ইতিহাসের বিরাট চেহারাটা আমাদের সম্মুখে ধরিবেন, তিনি এখনও আসেন নাই। সেই ভবিষ্যৎ গিবনের অপেক্ষায় আমরা আছি।

কিন্তু ইতিমধ্যে তো চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। আমাদের মনের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত এক একবার স্ফুলিঙ্গ হানিতেছে। আমাদের পুত্রকন্যাগণকে যে দেশের পুত্র-কন্যা করিতেই হইবে। তাহারা কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা জানিবে না? কেবল জানিবে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস মানে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি—যাহার মধ্যে কোন জৈব সম্বন্ধ নাই? সেই ইতিহাস পড়িয়া ভারত-বর্ষের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত না হইয়া অশ্রদ্ধাই যে বর্দ্ধিত হইবে। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তাহারা পড়ে, তাহাতে ইতিহাসের কঙ্কালের হাড়গুলো পর্য্যন্ত সুসজ্জিত করা হয় নাই—রক্তমাংসের অভাব তো দূরের কথা। এই বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টস্তূপের মধ্যে কে তাহাদিগকে ভিখারী-ভিখারিণীর মত শুক্‌নো হাড় চুষিয়া রস বাহির করিবার প্রস্তাব করে? যে করে, সে দেশকে ভাল বাসে না। সে জানে না যে, যেখানে সমগ্রতার ছবি নাই, সেখানে মানুষের প্রেম নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছিন্ন মাল্যের শক্ত গ্রন্থিগুলা তাহাকে ফাঁসির দড়ির মত ভারতবর্ষের তরুণ সন্তানদের নিকটে বিভীষিকাপূর্ণ করিবে।

কিন্তু, না। সেই ছিন্ন মাল্যের মধ্যে এখানে সেখানে পুষ্পস্তবক যে আছে। তাহাদের সুগন্ধ আজিও পাওয়া যায়। কারণ তাহারা

ভারতের প্রাণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে—সেই প্রাণবৃক্ষে তাহাদের পুষ্পোৎসব শেষ হয় নাই। ঘটনা ঘটে এবং তাহার পরে ইতিহাসের পাতায় মসীচিহ্ন রাখিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়! কিন্তু সত্য সাধনা যখন ঘটে, তখন কালে কালে মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে সে পথ করিয়াই চলে, তাহার আর শেষ হয় না।

এই জন্য ভারতবর্ষের ঘটনার ইতিহাস নাই, কিন্তু সাধনার ইতিহাস আছে। বুদ্ধ, নানক, কবীর, প্রভৃতির সাধনা যে বিশেষ এক যুগেই ফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভক্তমধুপদের দিগ্‌দিগন্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। সে ফুল অমরতার ফুল, তাহা ফুটিয়াই আছে। সম্প্রদায় তাহাকে ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ করিয়াছে, তাহাকে ধূলায় লুটাইয়াছে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত বদ্ধ মন্দিরের নির্ম্মাল্য ফুল তো সে নয়। সে যে প্রাণের জিনিষ। এই জন্য ভারতবর্ষে যেখানে যে সময়ে প্রাণ জাগিয়াছে, সেই খানে সেই সময়ে তাহার নূতন স্ফুটন দেখা দিয়াছে। উপনিষদের সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করিবার সাধনা বুদ্ধদেবের বিশ্বমৈত্রীর সাধনার মধ্যে আপনাকে নূতন করিয়া ফুটাইয়াছিল এবং সেই প্রাচীন অদ্বৈতবাদ মধ্যযুগে দ্রাবিড়ী বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও মুসলমান সুফী-ধর্ম্মের সহিত ত্রিবেণীসঙ্গমে মিলিত হইয়া কবীরের সাধনার মধ্যে নববিকাশ লাভ করিয়াছিল। নানকের সাধনায়, রবিদাসের সাধনায় এই হিন্দু মুসলমানের দ্বৈত রসধারার জোয়ার লাগিয়াছিল—তাহাদের সাধনার ফুলের মধ্যে সুফীধর্ম্মের রং এবং হিন্দুর রসানুভূতির রং এম্‌নি মেলা মিলিয়াছে যে, চেনা শক্ত।

কিন্তু এই সকল প্রাণের ক্রিয়াকে সূচের মত করিয়া ঘটনার সঙ্গতিসূত্রের মধ্যে যে পণ্ডিত পরাইতে যান—তিনি জানেন না যে, এই প্রাণের সূচের মধ্যে বরং হাতী গলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার বাঁধা

ইতিহাস গলে না। যে মুসলমান ধর্ম্ম কবীর-নানকের সাধনার মধ্যে রস সঞ্চার করিয়াছে এবং নবরূপ লাভ করিয়াছে, সেই মুসলমান ধর্ম্মই আবার বর্ত্তমান কালে রামমোহনকে দিয়া প্রাচীন শাস্ত্রখনি খনন করাইয়া বেদান্তরত্নকে উদ্ধার করাইয়াছে। কবীরের সাধনতত্ত্ব তাঁহার বাণীর মধ্যে এক জায়গায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ ঃ—

"ভিতর কহুঁতো জগময় লাজৈ
বাহর কহুঁতো ঝুটালো।
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর
চিত অচিত দৌ পীঠালো।"

অর্থাৎ যদি বলি, তিনি ভিতরে, তবে জগৎ লজ্জা পায়, যদি বলি, বাহিরে তবে সে মিথ্যা হয়। বাহির অন্তরকে তিনি নিরন্তর করিয়া আছেন; চেতন ও অচেতন তাঁহার দুই পাদপীঠ। অথচ কবীরের এই সাধনা যখন উত্তর কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবলতর প্রভাবে ভগবানের অরূপত্বকে ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়া রূপ ও রূপকের জালকে ঘনীভূত করিল, তখন 'জগময় লাজৈ'—সমস্ত বিশ্বজগৎ লজ্জিত হইল। যিনি এক তিনি হইলেন অনেক। তখন পুনরায় মুসলমান-ধর্ম্মালোচনার আঘাতে যে মহাপুরুষ এক দিন এই বাংলা দেশে জাগ্রত হইলেন, তিনি প্রচলিত ভক্তিধর্ম্মের সকল জঞ্জালকে ঠেলিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ 'দেউলে'র দেবতাকে বাহির করিয়া দিলেন। তিনি বিশ্বধর্ম্ম ও বিশ্বসভ্যতার মাঝখানে আমাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে দেখিবার প্রয়াসে আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম রূপকে উপনিষদের ভিতর হইতে আবিষ্কার করিলেন। তিনি যাহা করিলেন, সেই খানেই কিন্তু এই নব সাধনার স্রোত থামিয়া গেল না। সে নূতন নূতন পথ কাটিয়া চলিল। সে ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন ব্রহ্মনামমুখরিত পূর্ব্বাচল হইতে বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্মপ্রবাহের তরঙ্গসঙ্কুল মধ্যপথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিম সমুদ্র-

প্রান্তবর্ত্তী পশ্চিমাচল পর্য্যন্ত সমস্ত ধারাগুলিকে এক করিয়া মিলিত করিয়া বৃহৎ করিয়া বিরাট করিয়া দেখিতে চায়। ভারতের সেই চিরন্তন সাধনা তাই আজিও জীবিত।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় "ভারতীয় সাধক" বলিয়া যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মধ্যে ভারতীয় সাধনার এই অন্তরতর যোগসূত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গ্রথিত সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। কার্লাইল তাঁহার Heroes and Hero Worship নামক গ্রন্থে সমস্ত জগতের ইতিহাসকে মহাপুরুষদের জীবনচরিত ও সাধনার ভিতর হইতে পড়িতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জগতের ইতিহাসকে কেবল মহাপুরুষদের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ জগতের ইতিহাসের গঠনে কেবল মহাপুরুষদের হাত নাই, জনসঙ্ঘেরও হাত আছে। যাহাই হউক, ভারতবর্ষের মহাপুরুষগণের, সাধকগণের ইতিহাস যে এক হিসাবে ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাস এবং একমাত্র ইতিহাস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পাশ্চাত্য সভ্য দেশগুলির মত শক্তিমান্ হয় নাই। যে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জনসমূহ ব্যূহবদ্ধ হইয়াছে, সে ক্ষেত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্র—রাষ্ট্রের ক্ষেত্র নহে।

এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু ভারতবর্ষের যে সাধকগণের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস-মাল্যের যথার্থ পুষ্পস্তবক। তাঁহারা চিরপ্রাণ। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে নির্ম্মল জীবন যাপন করেন নাই; তাঁহারা ঘরের বা গ্রামের লোক নহেন—তাঁহারা ইতিহাসের মানুষ। তাঁহাদের সাধনা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বরাবর নব নব গতি দান করিয়াছে। ভারতবর্ষের সমাজের আচার, নিয়ম, অনুশাসন তাঁহারা সকলেই অগ্রাহ্য করিয়া খোলা রাস্তায় বাহির হইয়াছেন এবং সকলকেই সেই রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়াছেন।

ইহা হইতে আর একটি কথা আমাদের মনের মধ্যে সহজেই উদিত হয়। ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে যেমনি মত পোষণ করি না, ভারতবর্ষের সমাজ যে বরাবর তাহার ধর্ম্মসাধনার যথার্থ সত্য যথার্থ প্রাণের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, তাহা এই সকল সাধকের জীবনী হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে একজনও নাই, যিনি সমাজের দ্বারা নিগৃহীত হন নাই এবং যাঁহাকে সমাজের গণ্ডী ভাঙিয়া বিশ্বের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতে হয় নাই। সুতরাং যাহারা বলে যে, ভারতবর্ষের এই আশ্চর্য্য সমাজ এমন আদর্শে গঠিত যে, এখানে ধর্ম্ম লাভ একবারে নিশ্বাস লাভের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক এবং এ সমাজের সকল নিয়ম, ধর্ম্মের নিয়ম ও সকল আচার ধর্ম্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে এই পুস্তকখানি প্রশ্ন স্বরূপে পড়িতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ব্যতীত যে কোনো প্রাণময় জীবনময় ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত এ দেশের প্রাণের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, সে ধর্ম্মে গোড়ায় সমাজদ্রোহিতাই ছিল। সমাজের প্রতি আনুকূল্যের ভাব ছিল না। তাহার পরে কালক্রমে এদেশে সেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কোনটি বা বিলুপ্ত হইয়াছে, কোনটি বা সমাজের সঙ্গে কোনমতে আপোষ করিয়া লইয়াছে। বৌদ্ধরা তো এ দেশ হইতে বহুকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক অন্ত্যজ জাতি বৌদ্ধ। তাহারা যথার্থ অনার্য্যজাতি নহে ; কিন্তু হিন্দুগণের উৎপীড়নে তাহারা হীন দশায় পতিত হইয়াছে। নানকপন্থী শিখেরা জাতিভেদ এক রকম তুলিয়া দিয়াছে। অন্যান্য দল বৃহৎ হিন্দু সমাজের মধ্যে আচার পালন করিয়া কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাণ উৎস এক এক যুগে এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবে ক্ষণকালের জন্য উৎসারিত হইয়া এই সমাজের চাপে পুনরায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য ভারতবর্ষের শেষ মহাপুরুষ রামমোহন রায় কেবলমাত্র ধর্ম্মের

ভাবগত আন্দোলন জাগাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সমাজকে সেই বৃহৎ ধর্ম্মের অনুরূপ করিয়া গড়িবার জন্য তাহার সংস্কার সাধনের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি সমাজের শিক্ষাদীক্ষা আচারব্যবহার বিধিবিধান সমস্তই ধর্ম্মের অনুগত করিয়া উদার করিয়া বৃহৎ করিয়া দাঁড় করাইবার প্রয়াসে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।



সাধক বুদ্ধ

ভারতীয় সাধক



বুদ্ধ

"জননী যেমন স্নেহে আপনার প্রাণ দিয়াও পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন, সর্ব্বজীবের প্রতি তোমার সেইরূপ অপরিমেয় দয়ার ভাব জাগিয়া উঠুক। ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, চারিদিকে যত প্রাণী আছে, তুমি সকলের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মনে অপরিমিত দয়া দেখাইও। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ না নিদ্রিত হও তাবৎ এই প্রকার মৈত্রীময় ভাবের মধ্যে তোমার মনের অবস্থান হউক।"

"আপনি আপনার নির্ভরের দণ্ড হও, অন্য কাহারো সহায়তার প্রত্যাশা করিও না। আপনি আপনার প্রদীপ হও, সত্যই সেই প্রদীপ। এই প্রদীপ দৃঢ়করে ধারণ করিয়া নির্ব্বাণসাধনায় প্রবৃত্ত হও।"

"কোন পাপ কর্ম্ম না করা, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা এবং আপনার চিত্তকে নির্ম্মল করা, ইহাই অনুশাসন।"

"ধর্ম্মকে তোমার বিচরণের প্রমোদকানন কর, ধর্ম্মকে তোমার আনন্দ কর, ধর্ম্মে তোমার প্রতিষ্ঠান হউক, ধর্ম্মই তোমার জ্ঞাতব্য

বিষয় হউক, যাহাতে ধর্ম্ম ম্লান হইতে পারে এমন কোনো বিতণ্ডা তোমার মনে স্থান দিও না এবং সুভাষিত সত্যালোচনায় তোমার সময় অতিবাহিত হউক।”

সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক মহাপুরুষ এই অপূর্ব্ব মৈত্রী, গৌরবময় আত্মনির্ভর এবং কল্যাণকর সদ্ধর্ম্মের বাণী শুনাইবার নিমিত্ত হিমগিরির পাদদেশে কপিলবাস্তু নগরে শাক্যকুলনায়ক শুদ্ধোদনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে এই শিশু সাতদিন-মাত্র জননী মহামায়ার অঙ্কে স্থান পাইয়াছিলেন। সপ্তম দিনে মাতৃবিয়োগ ঘটিলে বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী তাঁহার প্রতিপালনভার গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ জনকের সাংসারিক সুখসাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই শিশু সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ নাম পাইয়াছিলেন।

জনকের, বিমাতার ও পুরবাসীদিগের অযাচিত অপার স্নেহ এই শিশুর তরুণচিত্ত আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিত না। তিনি স্বভাবতঃ উদাসীন এবং সংসারবিমুখ ছিলেন। তীক্ষ্ণধী বলিয়া অত্যল্পকাল-মধ্যে তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং ক্ষত্রোচিত যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

কিশোরবয়সেই সিদ্ধার্থের তরুণ হৃদয় সমগ্র প্রাণীর বেদনায় কাঁদিয়া উঠিত। নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদের মাঝখানে থাকিয়াও মাঝে মাঝে তিনি বুঝিতেন, জরাব্যাধিমৃত্যু মানুষের জীবন দুঃখময় করিয়া রাখিয়াছে। কি উপায়ে জীবকুল এই অশেষ দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, এই চিন্তা বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় সময়ে সময়ে তাঁহার মনে উদিত হইত। সিদ্ধার্থের মনে শৈশবে-কৈশোরে তাঁহার ভাবী জীবনের অত্যুচ্চ আদর্শ মূর্ত্তিপরিগ্রহ না করিয়া থাকিলেও, ঐ উচ্চ আদর্শের অস্পষ্ট ছায়া তাঁহাকে মাতাইয়া দিয়াছিল। তিনি

বুঝিলেন, সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি কঠিন সাধনা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

• মনের এমনি অবস্থা ছিল বলিয়া সংসারের কোনো কাজেই তাঁহার মন বসিত না। তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও বৈরাগ্য বিষয়ী পিতা শুদ্ধোদনকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। শাক্যকুলের পরম রূপবতী ও অশেষগুণশালিনী গোপার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহ দিলেন। সাধ্বী গোপাকে জীবনসঙ্গিনী পাইয়া কিছুকালের নিমিত্ত সিদ্ধার্থের জীবন সুখময় হইয়াছিল।

সাংসারিক সুখের দিকে সিদ্ধার্থের মনের গতি যখন একটু ফিরিয়াছিল, তখনই বসন্তকালে নগরভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি প্রথম দিনে পলিতকেশ শিথিলচর্ম্ম কম্পিতপদ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে শুষ্কশীর্ণবিবর্ণ গতিশক্তিহীন রোগী এবং তৃতীয় দিনে মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। জরাব্যাধিমৃত্যুর এই শোকাবহ দৃশ্য সিদ্ধার্থ তাঁহার ঊনত্রিংশৎ বৎসরপরিসর জীবনে শত সহস্রবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। জীবের এই অপরিহার্য্য দুঃখ তাঁহার চিন্তারও বিষয়ীভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময়ে সহসা তিনি যেন নূতন করিয়া দিব্যনেত্রে এই সকলের দুর্জ্ঞেয় রহস্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চিত্তে চিন্তার প্রবল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। এতকাল যে ভাবনা তাঁহার মনকে অস্থায়িভাবে মাঝে মাঝে অধিকার করিত, এক্ষণে সেই ভাবনা চিরদিনের জন্য মনে মুদ্রিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, জরা যাহার স্বাস্থ্য এবং শ্রী একদিন-না-একদিন অপহরণ করিবে, তুচ্ছ ভোগসুখে প্রমত্ত হওয়া তাহার পক্ষে কি শোভা পায়? ব্যাধি যাহাকে প্রতি-মুহূর্ত্তে আক্রমণ করিয়া পীড়িত ও ক্লিষ্ট করিতে পারে, অনিত্য সুখের সন্ধানে তাহার কি ছুটাছুটি করা কর্ত্তব্য? ভীষণ মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া নিরন্তর যাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহার কি প্রমত্তভাবে

শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করা সঙ্গত ? সিদ্ধার্থের মনে প্রশ্ন উঠিল—সে কোন্ সাধনা, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে মানব এই অনন্ত দুঃখ লঙ্ঘন করিয়া সুখকর কল্যাণকর শান্তিপ্রদ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে ? তিনি এই অন্তহীন ভাবনায় আবিষ্ট হইলেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না।

মনের যখন এই অনিশ্চিত অবস্থা, তখন এক গৈরিক পরিচ্ছদ-ধারী সৌম্যমূর্ত্তি সাধু তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সাধুর নির্ব্বিক.র ভাবে তিনি মুগ্ধ হইলেন ; ভাবিলেন, এমনি অনাসক্ত ও গৃহত্যাগী হইয়া সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি মুক্তির একটি পথ আবিষ্কার করিবেন। তাঁহার মনে হইল, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়া এই মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর হইবে না। এই সময়ে সিদ্ধার্থের চিত্তে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদিকে ত্যাগের গভীর আহ্বান, অন্যদিকে সংসারের সুখভোগ ও স্নেহমমতার প্রবল আকর্ষণ· যখন তাঁহার মনে চিন্তার এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছিল, তখন তিনি একদিন সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী গোপা এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, স্নেহের একটি নূতন বন্ধন তাঁহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সিদ্ধার্থ বুঝিতে পারিলেন আর বিলম্ব করা বিধেয় হইবে না, সকল মানবের দুঃখের বোঝা শিরে লইয়া অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ।

সিদ্ধার্থ পিতাকে তাঁহার সংসার ত্যাগের কারণ ও সংকল্প নিবেদন করিলেন। পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি তখন পিতাকে কহিলেন, "আপনি আমাকে চারিটি বর প্রদান করিলেই আমি সংসারে থাকিতে পারি :—

(১) জরা যেন আমার যৌবন নাশ করে না।

(২) ব্যাধি যেন আমার স্বাস্থ্য হরণ করে না।

(৩) মৃত্যু যেন আমার জীবন বিনাশ করে না।

(৪) আমার সম্পদ্ যেন কদাচ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।"

পুত্রের প্রার্থনা শুনিয়া পিতার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রকে কহিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা মানবের সাধ্যাতীত। তুমি এই অসম্ভবের অনুসরণ করিয়া আপনার জীবন দুঃখময় করিও না।"

পিতার এই উত্তরে সিদ্ধার্থের মন একটুও সায় দিতে পারিল না। শুদ্ধোদন যাহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, সিদ্ধার্থের মন তাহাকেই সম্ভব করিয়া তুলিতে চাহে। যে মহাভাব তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়াছে, ভাবী সাফল্যের যে আশা তাহার মনে অপূর্ব্ব বল সঞ্চার করিতেছে, সেই ভাবকে, সেই আশাকে তিনি একান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সিদ্ধার্থ বিনীতভাবে পিতাকে কহিলেন—"মৃত্যু আসিয়া একদিন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেই, সুতরাং আপনি আমার সাধনপথের বিরোধী হইবেন না; সংসারত্যাগ ভিন্ন শ্রেয়োলাভের আমি দ্বিতীয় কোনো উপায় দেখিতেছি না।"

পিতার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া সিদ্ধার্থ বিদায় লইলেন। পুত্রের গৃহত্যাগে বাধা জন্মাইবার নিমিত্ত শুদ্ধোদন দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।

ভারাক্রান্তচিত্তে সিদ্ধার্থ পত্নী গোপার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় নৃত্যগীত চলিতেছিল। সেই আনন্দ তাঁহার মন স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি মৌনী হইয়া আপনার ভিতরে আপনি কি-যেন ভাবিতেছিলেন। পতির এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া গোপা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজ এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" সিদ্ধার্থ উত্তর করিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিতেছি, সেই আনন্দই আজ আমাকে পীড়িত করিতেছে—কারণ

আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, আমাদের এই মিলনের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, জরাব্যাধিমৃত্যু আমাদের সুখের পথের প্রবল অন্তরায়।”

সিদ্ধার্থের মনের সুখশান্তি-আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি আপনার মহোচ্চ সংকল্পের সাধনার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে স্নেহমমতার বন্ধন ছিঁড়িয়া গৃহত্যাগের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রি, পৌরগণ সুখসুপ্ত। সিদ্ধার্থ নিদ্রিতা পত্নীর পাশ্বে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তখন তিনি আপন হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে বাণী শুনিলেন—সময় উপস্থিত। সুপ্তা পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, “প্রিয়তমে, জীবের অপরিহার্য্য দুঃখে আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া আছে; সকল মানবের দুঃখ শিরে ধারণ করিয়া আমাকে সাধনা করিতে হইবে। আমাদের বিচ্ছেদ এই অনন্তকল্যাণ-লাভের সহায়তা করুক; সর্ব্ব মানবের হিতকর কল্যাণকর এই মুক্তির পথ আবিষ্কার না করিয়া আমি আর গৃহে ফিরিব না।”

সিদ্ধার্থ একবার স্নেহকরুণ নয়নে পত্নীর ও নবজাত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরপদে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। সেই শান্ত স্তব্ধ নিশীথে আকাশ বাতাস নক্ষত্র সকলেই নিঃশব্দে ভাবী মহা-পুরুষকে সীমাহীন পথে আহ্বান করিয়া লইল। সিদ্ধার্থ কোনোরূপে তাঁহার সারথি ছন্দককে সম্মত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করিলেন। আজন্মঅধ্যুষিত গৃহের সুখস্মৃতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে ক্ষিপ্রগামী অশ্বপৃষ্ঠে সিদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন। রাত্রিশেষে অনোমা নদীতীরে প্রভাতের শিশিরস্নাত অরুণরশ্মি তাঁহার নয়ন স্পর্শ করিল।

নদীর পরপারে গমন করিয়া সিদ্ধার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; নিরাভরণ হইয়া পরিচ্ছদ সারথির হস্তে অর্পণ করিয়া

কহিলেন, "যাও, তুমি অবিলম্বে কপিলবাস্তুনগরে গমন করিয়া জনক-জননী ও পরিজনদিগকে আমার কুশল সমাচার জ্ঞাপন কর।" অশ্রুসিক্তলোচনে সারথি ফিরিয়া চলিল। এইখানে সিদ্ধার্থ তাঁহার কেশমুণ্ডন করেন এবং এক ব্যাধের সহিত বস্ত্রবিনিময় করিয়া ছিন্ন কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন।

সিদ্ধার্থ ভিখারিবেশে অজানা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির সহিত প্রত্যক্ষপরিচয়-মানসে তিনি নানা সাধুসন্ন্যাসী ও ঋষির আশ্রম ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজগৃহে নৃপতি বিম্বিসারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। বিম্বিসার তাঁহাকে সংসারে ফিরাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থ সুপণ্ডিত আড়ার কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের নিকটে কিছুকাল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কিঞ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই সুপণ্ডিত ঋষিদিগের সাহচর্য্যে তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারিল না। মুক্তির যে উদার পথ বাহির করিবার জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহার এই অধ্যাপকগণ সেই পথের সন্ধানের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুলতা অনুভব করেন না। সত্যানুসন্ধানের প্রবল প্রেরণায় অবশেষে সিদ্ধার্থকে এই গুরুদের আশ্রয়ও ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার এই অসামান্য সত্যানুসন্ধিৎসা রুদ্রকের পাঁচটি শিষ্যকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহারা সিদ্ধার্থের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।

অনুবর্ত্তী পঞ্চশিষ্য সহ সিদ্ধার্থ নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বচ্ছসলিলা নৈরঞ্জনার তীরে উরুবিল্ববনে উপস্থিত হইলেন। এই বন-ভূমির শান্তশোভা তাঁহার মন মুগ্ধ করিল। সাধনার এই অনুকূল ক্ষেত্রে তিনি ধ্যানপ্রভাবে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার সংকল্প করিলেন।

কৃচ্ছ্রসাধনা সুফল প্রসব করিবে মনে করিয়া তিনি দেহের দাবীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দুঃখবিমুক্তির উপায় মনন করিতে লাগিলেন। কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি, কত শীত, কত গ্রীষ্ম তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। তাঁহার দৈহিক লাবণ্য বিলুপ্ত হইল, সুগঠিত বলিষ্ঠ বপু কঙ্কালে পরিণত হইল।

কিন্তু এত ক্লেশ, এত যাতনা স্বীকার করিয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বোধি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্তের ব্যাকুলতা কিছুতেই দূর হইল না। তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে না, এবং ইহা দ্বারা সত্যের বিমল আলোকলাভ দুরাশামাত্র। একদা একটি জম্বুতরুতলে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধার্থ তাঁহার মনের অবস্থা এবং কৃচ্ছ্রসাধনার ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—'আমার দেহ ক্ষীণ, ক্ষীণতর হইয়াছে; উপবাসের দ্বারা আমি কঙ্কালে পরিণত হইলাম কিন্তু তথাপি নির্ব্বাণ-লোকের কোনো সন্ধানই পাইলাম না। আমার অবলম্বিত এই কৃচ্ছ্রসাধনার পন্থা কিছুতেই আর্য্যমার্গ হইতে পারে না। এক্ষণে যুক্তপানাহার দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া মনকে সত্যলোকের সন্ধানে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।'

এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি নৈরঞ্জনার নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিয়া স্নান করিলেন; তাঁহার শরীর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, স্নানান্তে চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজের শক্তিতে তীরে উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে নদীবক্ষে অবনত একখানি বৃক্ষশাখা ধরিয়া তিনি কূলে উঠিলেন।

মন্থরগমনে সিদ্ধার্থ আপন কুটীরের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে বনপথে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। পঞ্চশিষ্য মনে

করিলেন, সিদ্ধার্থের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতি সিদ্ধার্থ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কোন্ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। ভাবনার পর ভাবনার তরঙ্গ উঠিয়া সিদ্ধার্থের সংশয়াকুল চিত্ত দোলাইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, 'যেন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে একটি ত্রিতন্ত্রী হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন; উহার একটি তার দৃঢ়রূপে বাঁধা ছিল—তাহাতে আঘাত করিবামাত্র শ্রুতি-কটু বিকৃত সুর বাহির হইল; অন্য একটি তার নিতান্ত শিথিল ছিল, উহা হইতে কোনো স্বরই নির্গত হইল না। মধ্যবর্ত্তী তারটি না-শিথিল না-দৃঢ় এমনই ভাবে যথাযথরূপে বাঁধা ছিল; সেই তারটিতে ঘা পড়িবামাত্র মধুর সুরে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল।'

নিদ্রাভঙ্গে সিদ্ধার্থের হৃদয় সত্যের বিমল আবির্ভাবে পূর্ণ হইল। সাধনার উদার মধ্যপন্থা তাঁহার মনশ্চক্ষুর প্রত্যক্ষ হইল। ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যবর্ত্তী সত্যমার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি বোধি লাভের জন্য স্থিরসংকল্প হইলেন।

নিষ্ফল কঠোর সাধনায় স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া, সিদ্ধার্থ চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছেন, বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ মন বোধি লাভের পক্ষে অনুকূল। দেহকে সবল করিয়া মনকে জাগরিত করিয়া তিনি নবীন সাধনায় পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবেন, স্থির করিলেন। এই সংকল্পে উপস্থিত হইয়া, তিনি এক দিন শেষ রজনীতে সুস্নাতশুচি হইয়া একটি সুপরিষ্কৃত তরুমূলে ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন।

সমীপবর্ত্তী সেনানীগ্রামের এক ধনবান্ বণিকের পুণ্যবতী দুহিতা সুজাতা বহু সাধনার ফলে একটি পুত্রধন লাভ করিয়া সুবর্ণপাত্রে পায়সান্ন সাজাইয়া এইদিন বনদেবতার পূজা দিতে আসিলেন। তাঁহার এক সঙ্গিনী অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন। তিনি তরুমূলে উপবিষ্ট

ক্ষীণাঙ্গ সিদ্ধার্থের ধ্যানসুন্দর মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া সুজাতাকে কহিলেন, "সখি, ত্বরায় চলিয়া আইস, দেবতা প্রসন্ন হইয়া তোমার ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" হৃষ্টচিত্তে সুজাতা দ্রুতপদে তরুমূলে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাবিকম্পিত করে দেবতার হস্তে পায়সান্নের পাত্র প্রদান করিলেন। "তোমার কামনা পূর্ণ হউক" বলিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহার মহৎ দান গ্রহণ করিলেন। সুস্বাদু পায়সান্ন ভোজন করিয়া তাঁহার দুর্ব্বলদেহে বলের সঞ্চার হইল। তিনি মধুরকণ্ঠে সুজাতাকে কহিলেন, "হে ভদ্রে, আমি দেবতা নই, তোমারই মত মানুষ ; তোমার মঙ্গল হস্তের মহৎ দান আজ আমার প্রাণরক্ষা করিল, মনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিল। আমি যে সত্যের সন্ধানে রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, তোমার এই অন্ন সেই সত্যলাভের সহায় হইল। আমার মনে আজ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আমি সেই সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। তোমার কল্যাণ হউক।"

এই ঘটনার পরে সিদ্ধার্থ নিয়মিত পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন পঞ্চশিষ্যের মনে গভীর সন্দেহের সঞ্চার করিল। তাঁহারা ভাবিলেন, সিদ্ধার্থ তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া সাধনার সত্যপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। এতদিন তাঁহারা যাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছেন, এখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। বিমুখ শিষ্যদের এই শ্রদ্ধাহীনতা সিদ্ধার্থকে পীড়িত করিল ; অন্তরের সেই বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি প্রশান্তচিত্তে একাকী মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নৈরাশ্যের মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় সিদ্ধার্থের চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের আনন্দে বিশ্বপ্রকৃতি প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি যখন মৃদুলগমনে বোধিদ্রুমের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন

তাঁহারই আনন্দপুলকে পদতলে ধরিত্রী যেন শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। আপনার মহাসাধনার সফলতাসম্বন্ধে সন্দেহের শেষরেখাটুকু-পর্য্যন্ত যখন নিঃশেষে দূর হইল, তখন সিদ্ধার্থ অন্তর ও বাহির হইতে ক্রমাগত আশার বাণী শুনিতে লাগিলেন। অন্তর ও বাহির সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যেন ইহাই বলিতেছিল—"হে সাধক, হে বরেণ্য, তোমার সিদ্ধিলাভের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগতপ্রায়, তুমি মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কল্যাণের আকর নির্ব্বাণলোক আবিষ্কার কর।"

শ্যামলস্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে নবীন তৃণ বিছাইয়া সমাসীন হইলেন। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি সংকল্প করিলেন :—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যায়, যাক্; ত্বক্, অস্থি, মাংস, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, হউক; তথাপি বহুকল্পদুর্লভ বোধি লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবে না।

পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ এইরূপ মহাসংকল্পের বর্ম্মে আবৃত হইয়া সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইবার জন্য তিনি আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের প্রসুপ্ত পাপলালসাগুলি উপাড়িয়া ফেলিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন অল্প সময়ের জন্য দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সিদ্ধার্থের পাপ-লালসাগুলি চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণের জন্য তেমনি আর একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহী পাপসমূহের সহিত তাঁহার অন্তরে যে তুমুল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, বিবিধ কাব্যে

ও ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার চমৎকার রূপক বর্ণনা রহিয়াছে। পাপবাহিনীর সহিত সিদ্ধার্থের সেই সংগ্রামের বর্ণনা পাঠ করিলে মৃতকল্প ব্যক্তির হৃদয়েও অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হয়। নানা প্রলোভন দেখাইয়া কামলোকের অধিপতি মার সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি সুদৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন ঃ—

"মেরুঃ পর্ব্বতরাজ স্থানতু চলেৎ সর্ব্বং জগন্নো ভবেৎ
সর্ব্বে তারকসজ্ঘ ভূমি প্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রা নভাৎ৷
সর্ব্বে সত্ত্ব করেয় একমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো
নত্বেব দ্রুমরাজ মূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ ॥"

যদি পর্ব্বতরাজ মেরু স্থানচ্যুত হয়, সর্ব্বজগৎ শূন্যে মিশিয়া যায়, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহরাজি খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসাগর শুকাইয়া যায় ; তথাপি আমাকে এই দ্রুমমূল হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না।

অতঃপর পাপসৈন্যগণ মারের নির্দ্দেশ অনুসারে নানাপ্রলোভনে সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার অবিচলিত চিত্তের অমিতবিক্রম তাহাদের সকল চাতুরী ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে স্বয়ং মার নানা আয়ুধে সজ্জিত হইয়া সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইল। পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি একাকী কেন—

সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্র মেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথ মেরু পর্ব্বতবরঃ পাণীষু খড়্গো ভবেৎ।
তে মহ্যং ন সমর্থ লোম চালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ম্ ॥

এই তিন সহস্র মেদিনী যদি মারদ্বারা প্রপূর্ণ হয়, প্রত্যেক মারের হস্তের খড়্গ যদি পর্ব্বতবর মেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড হয়, তথাপি বিগ্রহে দৃঢ়বর্ম্মিত আমাকে আঘাত করা দূরে থাকুক, একবিন্দুও টলাইতে পারিবে না।"

মার পলায়ন করিল। সকল বাসনা, সকল সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি এখন "বুদ্ধ" হইলেন।

সিদ্ধার্থ এক্ষণে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি সকলপ্রকার প্রপঞ্চ শোক মোহ বাসনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমৃতের অধিকারী হইলেন। তিনি যে জয় লাভ করিয়া অনন্তজ্ঞানশালী হইয়াছেন, সেই জয়ের আর পরাভব নাই। এই বিজয়গৌরব তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন? ললিতবিস্তরে বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের যে অপূর্ব্ব আখ্যান রহিয়াছে, তাহাতে বুদ্ধের মুখেই উক্ত হইয়াছেঃ—

"মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"

মৈত্রীবলে জয়লাভ করিয়া আমি অমৃতরস পান করিয়াছি।

"করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"

করুণা-বলে জয় লাভ করিয়া আমি অমৃতরস পান করিয়াছি।

"মুদিতাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"

মুদিতা-বলে জয়লাভ করিয়া আমি অমৃতরস পান করিয়াছি।

"তমপেক্ষবলৈর্জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"

উপেক্ষাভাবনা-বলে জয়লাভ করিয়া আমি অমৃতরস পান করিয়াছি।

কৃষক শস্যকর্ত্তনের সময়ে এক হস্তে শস্য আঁকড়িয়া ধরে, অন্য হস্তে দাত্র ধারণ করে, সিদ্ধার্থকেও এই অমৃত শস্য আহরণের জন্য জ্ঞানরূপ দাত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা সিদ্ধার্থ যে অমৃতরস লাভ করিয়াছিলেন, সেই অমৃতলাভের পথে অবিদ্যা প্রবল অন্তরায় ছিল। তিনি কি উপায়ে এই অবিদ্যাকে বিনাশ করিলেন?

"ভিন্না ময়া হ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিন-বজ্রেণ।"

জ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত কঠিন বজ্রদ্বারা আমি অবিদ্যাকে ছেদন করিয়াছি।

যে দুঃখবিমুক্তির উদার পথের সন্ধানে সিদ্ধার্থ বাহির হইয়াছিলেন,

সাধনার সেই মধ্যপথ এখন তাঁহার প্রজ্ঞাগোচর হইল। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। যে গৃহকারক জীবের মধ্যে থাকিয়া গৃহনির্ম্মাণ করে, তাহাকে নব নব জন্ম দান করিয়া দুঃখ দিয়া থাকে, দিব্যনেত্রে সিদ্ধার্থ তাহাকে দেখিতে পাইলেন, জ্ঞানানলে গৃহকারকের কাষ্ঠদণ্ড ও গৃহাবলম্বন ভস্মীভূত হইয়া গেল। অহঙ্কারের উচ্ছেদ হওয়ায় বিশ্বভুবনব্যাপ্ত অনন্ত আনন্দের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ হইল।

সিদ্ধার্থ এখন আর সিদ্ধার্থ নহেন। তাঁহার তৃষ্ণা নাই, জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া তিনি অমৃতপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

বুদ্ধ যে অমৃত লাভ করিয়াছেন, কেমন করিয়া তিনি তাহা একাকী গোপনে সম্ভোগ করিবেন? একমাত্র আপনার নহে, সকল মানবের দুঃখ শিরে লইয়াই তো তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং, তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ অমৃতান্ন সর্ব্বমানবের মধ্যে বিতরণ না করিয়া নীরব থাকিবেন কেমন করিয়া?

একটি দ্বিধা তাঁহার মনে আসিল। যাহারা অহংবোধের খাঁচার মধ্যে পোষাপাখীর মত সুখে চলাফিরা করিতেছে, খোলা আকাশে যাহারা বিহার করিতেই ভয় পায়, সহসা তিনি তাহাদিগকে অজানা পথে আহ্বান করিলে, তাহারা সেই পথে বাহির হইতে চাহিবে কেন?

এমনি করিয়া সংস্কারের অবিদ্যার প্রাচীর রচনা করিয়া যাহারা তাহারই মধ্যে চিরকাল গতিবিধি করিতেছে, তাহাদের মনে এই এক বিষম আতঙ্ক রহিয়াছে যে, এই প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই তাহাদিগকে এক অন্তহীন ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে।

বুদ্ধ ভাবিলেন, ইহাদের নিকট অতর্কিতভাবে নূতন সত্য লইয়া উপস্থিত হওয়া বিড়ম্বনা। আপন মনে এইরূপ নানা বাদানুবাদ

করিবার পরে অবশেষে তাঁহার স্মরণ হইল, রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রম হইতে কৌণ্ডিল্য, অশ্বজিৎ, ভদ্রিক, বপ্র ও মহানাম এই পাঁচটি সত্যানুরাগী তরুণ যুবক একদা অমৃতান্নলাভের নিমিত্ত তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার আপনার ভাণ্ডারই রিক্ত ছিল; সুতরাং, তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারেন নাই। সত্য বটে, তিনি যখন কৃচ্ছ্রসাধনা ত্যাগ করিয়া নূতন সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করেন, তখন তাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সত্যানুরাগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুদ্ধ তাঁহার সদ্‌ধর্ম্মের অমৃতবাণী সর্ব্বপ্রথমে ইঁহাদিগকে শুনাইবার নিমিত্ত কাশীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে গমন করেন।

কৌণ্ডিল্য-প্রমুখ শিষ্যগণ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের সংবাদ পাইয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহারা সিদ্ধার্থের আগমনের সংবাদ পাইয়াও স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সত্যভ্রষ্ট সিদ্ধার্থকে কদাচ গুরুর সম্মান দেখাইবেন না। কিন্তু বুদ্ধ যখন তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নির্ব্বিকার সৌম্যমুখকান্তি দেখিয়া তাঁহাদের মনের সকল সন্দেহ দূর হইল। তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ভক্তিমান্ শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়কুম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়া গুরুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়ে বুদ্ধদেব সদ্‌ধর্ম্মের অমৃতরসে তাঁহাদের হৃদয়ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

শিষ্যেরা বুঝিলেন—"কল্যাণময় মুক্তির পথ ভোগবিলাস নহে, কৃচ্ছ্র-সাধনাও নহে; তাহা এই দুইয়ের মাঝখানে অবস্থিত। জগতে দুঃখ আছে, ইহা সত্য। জন্মে দুঃখ, জরাব্যাধিমৃত্যুতে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলনে দুঃখ। মানুষ আত্মশক্তিতেই,

অন্য কাহারো উপর নির্ভর না করিয়া, এই দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। বাসনার বিলোপ ঘটিলেই এই দুঃখ দূর হয়; এই নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ সাধনা গ্রহণীয়, অর্থাৎ দৃষ্টি সংকল্প বাক্য ব্যবসায় জীবিকা চেষ্টা স্মৃতি ও ধ্যানে সাধুতা অবলম্বন করিতে হয়। ধ্যানপ্রভাবে সাধক মন হইতে সকল পাপলালসা দূর করিবেন; চিত্তকে সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে উন্নত করিয়া পবিত্রতা ও শান্তির মধ্যে বিহার করিবেন। তিনি ভাবিবেন, সমস্ত স্ত্রী, সমস্ত পুরুষ, সমস্ত আর্য্য, সমস্ত অনার্য্য, সমস্ত দেব, সমস্ত মনুষ্য, সমস্ত নরকাদিস্থিত জীব বৈররহিত হইয়া বাধারহিত হইয়া সুখী হইয়া আপনাদিগকে পরিচালিত করুক।

জননী যেমন আপনার প্রাণ দিয়াও পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন, সাধক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় প্রীতি পোষণ করিবেন; সকল সময়ে সকল অবস্থায় তিনি তাঁহার মনকে এইরূপ মৈত্রীময় ভাবনায় নিবিষ্ট রাখিবেন।"

বুদ্ধদেব তাঁহার এই আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তকল্যাণ সদ্ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বাণী শিষ্যদিগকে শুনাইলেন। তাঁহারা এই ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

কিছু দিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা ষাট হইল এবং তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বুদ্ধের এই শিষ্যদলের সম্মিলনী "সঙ্ঘ" নাম ধারণ করিল। সমস্ত বর্ষা-ঋতু তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত নবধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিলেন। বর্ষান্তে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তোমরা এই নবধর্ম্মের নির্ব্বাণ-বাণী দেশে দেশে দিকে দিকে প্রচার কর। অমৃতের স্বাদ পাইলেই মানব প্রবৃত্তির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ-পথের যাত্রী হইবে।"

মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল, কোশল, বারাণসী প্রভৃতি নানারাজ্যে বুদ্ধদেব শিষ্যগণ সহ তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন। আর্য্য ও অনার্য্য সকলেই তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

বুদ্ধের বাণী ভারতীয় পতিতদিগের কর্ণে অভয়মন্ত্র শুনাইয়াছিল এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছিল। থেরগাথায় একজন থের নিজ মুখে আপনার জীবনকাহিনী এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—"নীচকুলে আমার জন্ম, আমি দীন-দরিদ্র ছিলাম, আমার ব্যবসায়ও অতি নীচ ছিল, লোকে আমাকে অবজ্ঞা করিত। আমি অবনতমস্তকে সকলকে সম্মান দেখাইতাম। অতঃপর আমি মহানগরী মগধে ভিক্ষুসমভিব্যাহারী মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের দর্শন পাই। তাঁহার দর্শনমাত্র আমার চিত্ত ভক্তিতে অবনত হইল, আমি মাথার বোঝা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলাম। সেই লোকশ্রেষ্ঠ আমার প্রতি করুণা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, আমি তাঁহার অনুগামী শিষ্য হইবার অধিকার চাহিলাম। করুণাময় প্রভু তৎক্ষণাৎ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আইস, সাধু, আমার সহিত আইস।'"

বুদ্ধ অসঙ্কোচে পতিতা বারাঙ্গনা আম্রপালীর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই ব্যবহারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া লিচ্ছবিরাজগণ অসন্তোষ প্রদর্শন করায়ও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। মহাপুরুষের করুণার শুভ্ররশ্মিসম্পাতে পতিতা নারীর চিত্ত-শতদল নিমেষমধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং তাহার মনোহর সুগন্ধ সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে বিস্মিত করিয়াছিল।

সকল মানবের বরণীয় এই মহাগুরু অনর্থকর জাতিভেদ, ধনগৌরব, পদগৌরব প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিতেন বলিয়াই উচ্চনীচ, ধনী-দরিদ্র, আর্য্য-অনার্য্য সকলেরই চিত্তে তাঁহার বাণী অবাধে প্রবেশ

লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার বাণী সার্ব্বভৌম বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভারতের পতিত জাতি উহা আনন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। এই উদার ধর্ম্মপ্রভাবে ক্ষৌরকার উপালি হীনজাতি হইয়াও মহাপুরুষ 'বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত হইলেন। তিনি আর শূদ্র রহিলেন না, পরমসাধু অর্হৎ এবং সদ্‌ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা হইয়া পরম সম্মান লাভ করিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে বুদ্ধ পাবা-গ্রামের চুন্দনামক এক কর্ম্মকারের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাশীল চুন্দের প্রদত্ত অন্ন পিষ্টক ও শুষ্ক শূকরমাংস ভোজন করিয়া তিনি রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন।

এখান হইতে তিনি অসুস্থ দেহে কুশীনগরের উপপত্তনে শালকুঞ্জে গমন করেন এবং তথায় ৮১ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের পরিনির্ব্বাণ-লাভ হয়।

রামানন্দ

পরম ভাগবত রামানন্দ মধ্যযুগের সুবিখ্যাত একজন বৈষ্ণব সাধক। শ্রীসম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরু শ্রীরাঘবানন্দের করুণাকর-স্পর্শে তাঁহার চিত্ত-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে সাম্প্রদায়িক সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি ধর্ম্মজীবনে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সাধন-প্রণালী মহাত্মা রামানুজ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে প্রেমমূলক বৈষ্ণব সাধনার সুনির্ম্মল ধারা এই ভারতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, গুরু রামানুজ সমাজপ্রতিষ্ঠা করিয়া এই সাধনার ধারাটিকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীসম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবসমাজ।

শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থে প্রকাশ যে, ভারতীয় ভক্তিমার্গে এক সময়ে পাণ্ডিত্যের জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা রামানুজ সেই জঞ্জাল দূর করিয়া ভক্তির পথটিকে বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় কবি কৃষ্ণদাস বাবাজীর অনূদিত ভক্তমালগ্রন্থে প্রকাশ :—

"শ্রুতির কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল।
রামানুজ স্বামী বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধ ভক্তি-রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিল খেদাড়িয়া॥"

রামানুজ এই যে ভক্তির পুণ্যপ্রবাহ বহাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সুশীতল রসধারা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে আজপর্য্যন্ত ভক্তিপিপাসু শত শত নরনারীর তৃষ্ণার নিবারণ করিতেছে। ভুবন-পাবন রামানন্দের হৃদয়-

আলবাল এই অমৃত-ধারায়ই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈষ্ণব সাধনাতরু এই মহাত্মা রামানন্দকে অবলম্বন করিয়াই নানা শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বমঙ্গল রূপ ধারণ করিয়াছে। ভক্তমালগ্রন্থে এই মহাত্মার পুণ্যময় চরিত্রের ছবি অল্প কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতায় অতি উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত রহিয়াছে। তথায় লিখিত হইয়াছে ঃ—

"তাঁর (রাঘবানন্দের) শিষ্য হন্ শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ।
ভুবনপাবন যেহ ভক্ত পরানন্দ॥
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অবধি।
তাঁর মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি॥
শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয়।
সুখাসুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয়॥
শ্রীনরহরি শ্রীমান্ পীপা ভবানন্দ।
রুইদাস আর ধনা আদি শিষ্যবৃন্দ॥
বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গলস্বরূপ।
জীবত্রাণ কারণ দ্বিতীয় রামরূপ॥"

বৈষ্ণবকবি এই অল্প কয়েকটি কথা বলিয়াই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে রামানন্দের জীবনের কোনো ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সেই পরম ভক্তের সাধনার সুস্পষ্ট পরিচয় দেখা যাইতে পারে। এই বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিলাম, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যে দেবতা বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ভক্ত সেই রসস্বরূপের সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই রসস্বরূপের সহিত নিত্য বিহার হেতু তিনি এমন অলৌকিক আকর্ষণী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, রসলোলুপ মধুকরের ন্যায় অসংখ্য নরনারী তাহার চরণপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এই ভক্তমণ্ডলীর পুণ্যপ্রভা দেশদেশান্তর আলোকিত করিয়াছে।

একটি সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া এই মহাসাধকের ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল এই মহাত্মাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক খুঁটিনাঁটি আচার বিচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। রামানুজ-শিষ্যেরা আহার-সম্বন্ধী ছুঁত-ছোঁয়ার বিধিনিষেধ নিষ্ঠাসহকারে মানিয়া থাকেন। রামানন্দের বলিষ্ঠ মন কিছুতেই এই সকল আচার বিধি মানিতে চাহিত না। ভোগের সময়ে দেববিগ্রহের সম্মুখে স্থাপিত আহারসামগ্রী পূজারী ভিন্ন অন্যের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে কেন তাহা অশুদ্ধ হইবে, কেন তাহা দেবতা গ্রহণ করিবেন না, রামানন্দ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এই সমস্ত ছোটখাটো বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিবার অপরাধে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধুরা এই মহাত্মাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দের গুরু তাঁহার এই শিষ্যের অনন্য-সুলভ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়াই, বিদায় দিয়াও তাঁহাকে স্বাধীনভাবে নূতন সম্প্রদায়স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

রামানন্দের স্বাধীন আত্মা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে কোনো কৃত্রিম বাধাকে স্বীকার করিতে চাহিত না। তাঁহার আত্মা এমনি বলিষ্ঠ, মন এমনি সংস্কারমুক্ত ছিল যে, তিনি অতি অনায়াসে জাতিকুলের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া পুক্কশকেও (যবনকেও) ক্রোড়ে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহাদের দর্শন স্পর্শন আলাপন ও সহবাস পতিতকে এক মুহূর্ত্তে পরম ভাগবত করিয়া দিতে পারে, রামানন্দ এমনি শক্তিশালী বৈষ্ণব ছিলেন। মলয়মারুতের সুখদ স্পর্শে শুষ্কশীর্ণ তরুর জীবনী শক্তি যেমন নবকিশলয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, পরমভাগবত-দিগের পুণ্যস্পর্শে তেমনি শক্তিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রসুপ্ত ধর্ম্মবুদ্ধি নিমেষ-মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠে। কথিত আছে, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া রামানন্দ যখন তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, তখন মুচি রুইদাসকে

পথের জঞ্জাল দূর করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমাকে এই রাস্তার ধূলি জঞ্জাল ঝাঁট দিলেই চলিবে না। ধর্ম্মের পথে অনেক জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তুমি সেই আবর্জ্জনা দূর কর।" জোলা কবীরকে তিনি আলিঙ্গন দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সামান্য বস্ত্র বয়ন করিলে চলিবে না, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম্মের সার সত্যের সূত্র দিয়া অতি সুকৌশলে অপূর্ব্ব বস্ত্রবয়নের সাধনা তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে।"

পতিতকে, যবনকে, জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে সকলকে স্বীকার করিবার এই অসামান্য উদারতা রামানন্দ কেমন করিয়া লাভ করিলেন, সেই ইতিবৃত্ত আমরা অবগত নহি। তবে ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, একেশ্বরবাদী মহাপুরুষ মহম্মদের ধর্ম্ম তাঁহার চরিত্রের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রামানন্দের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই নবধর্ম্মবলে বলী মুসলমানগণ এক হস্তে অসি এবং অপর হস্তে কোরাণ লইয়া পুনঃপুনঃ ভারতবাসীর রাজ্য ও চিত্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা বাহুবলে ভারতে যেমন রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মবলে তেমনি ভারতবাসীর মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি বারাণসীধাম এক সময়ে এই দুই ধর্ম্মের আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই উভয় ধর্ম্মের সঙ্ঘাতভূমিই মহাত্মা রামানন্দের সাধনার স্থান ছিল। এই তীর্থক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার জীবনের উপলব্ধ উদার ধর্ম্মমত অসঙ্কোচে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই ক্ষেত্রেই তাঁহার অনুবর্ত্তী পরম সাধক কবীর মহাশয় রাম ও রহিমের একত্ব অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এই পুণ্যতীর্থে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে কেহই এই উদার-হৃদয় সাধকদিগের করুণালাভে বঞ্চিত হন নাই।

বিশাল বনস্পতি যেমন বীজের কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অনন্ত আকাশের মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, রামানন্দের চিত্তও তেমনি সম্প্রদায়ের আবরণ ভেদ করিয়া সর্ব্ব মানবের উদার লোকে উন্নীত হইয়াছিল। যে দেবতার মঙ্গল আবির্ভাবে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইয়াছিল, তিনি কোনো সম্প্রদায়ের দেবতা নহেন, কোনো মন্দিরের বিগ্রহবিশেষ নহেন—তিনি সকল দেশের সকল মানবের বরণীয় দেবতা। রামানন্দের হৃদয়তন্ত্রী যখন এই উচ্চসুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরে তিনি একদা বিষ্ণু-মন্দিরের মহোৎসবে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আপন হৃদয়-উৎস নিঃসৃত প্রেমমদিরা-পানে বিভোর হইয়া এক আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুজন, আমি কোথায় যাইব, আমি তো আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আছি, আমার মন তো আর বাহিরে বিহরণ করিতে চায় না; মন যে একেবারে অবশ হইয়া রহিয়াছে। হাঁ, একদিন ছিল—যখন আমার মন বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইত; তখন আমি পাদুকা প্রস্তুত করিতাম, চন্দন ঘষিতাম, গন্ধদ্রব্যের সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতাম এবং মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সন্ধানে ছুটাছুটি করিতাম। এমনি অবস্থায় সত্যগুরু আমাকে দয়া করিলেন, হৃদয়ের মধ্যে দেবতাকে দেখাইয়া দিলেন। হে আমার দেবতা, তুমি তো সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ।"

"বেদ ও পুরাণ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ঐ সব গ্রন্থে দেবতার প্রকাশ নাই। তিনি তো এই এখানেই আছেন। যদি না থাকেন, হে সুজন, তুমি মন্দিরে গমন কর। আমি আমার দেবতার নিকটে আপনাকে নিবেদন করিয়াছি। তিনি আমার সর্ব্ব সংশয় সকল দ্বৈধ ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। রামানন্দের দেবতা সর্ব্বত্রই বিরাজিত; তাঁহার করুণা কোটী কোটী পাপ বিনাশ করিয়া থাকে।"

নানক

"হে পরব্রহ্ম, তোমার পুণ্যময় নামে আমার প্রীতি হউক, তোমার নিকট ইহাই কেবল আমার প্রার্থনা, ইহা ছাড়া কখনো আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় নাই। হে সুন্দর, তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। নানক-চকোর তোমার নামামৃত-বারি পানের প্রার্থনা করিয়া থাকে, তুমি কৃপা করিয়া তাহাকে তোমার নামগানের অধিকার দান কর।

"তোমার নামই আমার প্রদীপ, দুঃখ সেই প্রদীপের তৈল। প্রদীপের দিব্য তেজে দুঃখ শুকাইয়া গিয়াছে, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছি। এক কণা অগ্নি যেমন পুঞ্জীভূত কাষ্ঠ ভস্মীভূত করে, তেমনি তোমার পুণ্য নাম লক্ষ লক্ষ পাপ বিনাশ করে। তোমার নাম আমার কাশী গঙ্গা, সেখানেই আমার আত্মা বিহার করে।"

"অধ্যাত্মজ্ঞান তোমার আহার্য্য হউক, করুণাকে সেই খাদ্য-ভাণ্ডারের প্রহরী কর। যে ধ্বনি প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে, তাহাই তোমায় সেই অন্নগ্রহণে আহ্বান করুক। যাঁহার করে এই বিশ্বযন্ত্র বাজিতেছে, তাঁহাকেই তোমার ধর্ম্মগুরুরূপে বরণ কর।"

"হে প্রিয়, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হউক; আমি তো তোমারই প্রতীক্ষায় দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি; আমার হৃদয় তোমাকেই প্রার্থনা করিতেছে। তুমিই আমার নির্ভর। তোমাকে দেখিয়া আমি সকল কামনা হইতে মুক্ত হইয়াছি; আমার জন্মের ও মৃত্যুর বেদনা



সাধক নানক

দূর হইয়াছে। সকল পদার্থে তোমার জ্যোতিঃ বিদ্যমান, উহা দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারা যায় বটে, কিন্তু প্রেম দ্বারা তোমাকে সম্যক্ লাভ করা যায়।”

এই কয়েকটি বাণীর মধ্যে ভক্ত নানকের যেরূপ পরানুরক্তি প্রকাশ পাইতেছে, সেরূপ অনুরাগ পৃথিবীতে দুর্লভ। এই সুদুর্লভ ধন লাভ করিতে হইলে যেরূপ আধ্যাত্মিক গভীর ক্ষুধার প্রয়োজন, নানক সেই ক্ষুধা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যকে তিনি সহজেই লাভ করিয়াছিলেন। শাবক যেমন ডিম্বের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া আলোকের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, নানকের চিত্ত তেমনি সকল কুসংস্কারের কঠিন আবরণ স্বভাবতঃ উদ্ভিন্ন করিয়াই ঈশ্বরকৃপার পুণ্যালোকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল।

এই মহাত্মার নামে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে, আমরা সেই আখ্যানগুলি সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বিশেষতঃ, কোনো কোনো প্রাচীনকালপ্রচলিত আখ্যান ইঁহার নামে লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ সকল আখ্যান হইতে ইহা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, নানক তাঁহার সমসাময়িক লোকের মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং লোকপ্রচলিত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার হইতে তাঁহার চিত্ত কিরূপ নির্মুক্ত ছিল।

এইরূপ কথিত আছে যে, শৈশবেই তিনি গভীর সত্যানুরাগের অমোঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নয় বৎসর বয়সে কুলগুরু হরিদয়াল পণ্ডিত তাঁহার গলদেশে উপবীত প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহাকে ঐ উপনয়ন প্রদানের অসারতা আশ্চর্য্যরূপে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন ঃ—“দয়া যার কার্পাস, সন্তোষ যার সূত্র, ইন্দ্রিয়সংযম যার গ্রন্থি, সত্য যার দণ্ডী এমন যে উপবীত তাহাই আত্মার যথার্থ উপবীত। হে ব্রাহ্মণ, তোমার যদি এমন উপবীত থাকে,

তাহাই আমাকে পরাইয়া দাও। এই উপবীত ছিন্ন হয় না, মলিন হয় না, আগুনে পোড়ে না, হারাইয়া যায় না। সেই লোক ধন্য, যে এমন উপবীত ধারণ করিতে পারে।"

এইরূপ প্রকাশ, একদা বিপাশা নদীতে নানক স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন, তথায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তর্পণ করিতেছেন। তিনি অবিলম্বে অকারণ তীরের দিকে জল সেচন করিতে লাগিলেন। এক পণ্ডিত প্রশ্ন করিয়া উত্তরে শুনিলেন, নানক তাঁহার জন্মভূমি তালবন্তীর শাকের ক্ষেত্রে জল দিতেছেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন, "বালক তুমি তো বড়ই নির্ব্বোধ ; কোথায় তোমার তালবন্তীর শাকের ক্ষেত, আর কোথায় তুমি জলসেচন করিতেছ?" নানক বলিলেন, "কে বেশী নির্ব্বোধ, তোমরা না আমি? আমার এই জল যদি কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী আমার শাকের ক্ষেত্রে না পৌঁছায়, তাহা হইলে তোমাদের প্রদত্ত ঐ জল কেমন করিয়া পরলোকগত পিতৃপুরুষদের নিকট পঁহুছিবে?" বালকের উত্তর পণ্ডিতদিগকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল।

নানকের ধর্ম্মবুদ্ধি কোনো প্রথার, কোনো অভ্যাসের, কোনো দেশাচারের সংকীর্ণতাকে স্বীকার করিতে পারিত না। শৈশবেই তাঁহার এবংবিধ শুভবুদ্ধি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, যাহা পরম সত্য তাহা কোনো লোকবিশেষে, সম্প্রদায়বিশেষে অথবা গ্রন্থবিশেষে নিবদ্ধ নহে। সেই পরম সত্য প্রত্যেক মানবের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছে, প্রত্যেক মানুষকে সমস্ত জীবন দিয়া সেই সত্যের সাধনা করিতে হয়। নানক বলেন, "মানব তখনই সার্থক হয়, যখন সে তাহার হৃদয়ে সত্যকে উপলব্ধি করে। মানব তখনই সার্থক হয়, যখন সত্যস্বরূপের প্রতি তাহার প্রেমোদয় হয়।"

"মানুষ মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর শাস্ত্র পাঠ করিতে পারে। সে সমস্ত জীবন, এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে পারে ; সেই শাস্ত্রবিদ্যা হয় তো তাহার মনের উপর বোঝা হইয়াই থাকিবে। নানক বলেন, একমাত্র পরব্রহ্মের নামই গ্রাহ্য হয়, আর সমস্ত দাম্ভিকের অর্থহীন বিতণ্ডা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।”

নানক তীর্থ ভ্রমণ, গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি যত বেশী তীর্থ ভ্রমণ করে, সে তত বেশী বাচালতা করে ; যে ব্যক্তি যত জাঁকজমক করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, সে ততই তাহার দেহের পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।”

নানক বাল্যাবধি যে মহাভাবের আবেশ আপনার চিত্তে অনুভব করিতেন, সেই আবেশ তাঁহাকে এমনি করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার বিষয়ী বণিক্ পিতা কালুকে বিন্দুমাত্র সুখী করিতে পারেন নাই। পিতা তাঁহাকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন, “পিতঃ, আমি একখানি নূতন ক্ষেত পাইয়াছি,—সেই ক্ষেতের কর্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, নূতন নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে ; এই সময়ে আমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইতেছে। এমন সময়ে আমার বাহিরের ক্ষেতের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর নাই, এবং তাহার ভার লইতেও পারি না।”

পুত্রের এই ধর্ম্মানুরাগের তত্ত্ব অর্থলোভী বিষয়ী পিতা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রকে অকর্ম্মণ্য মনে করিলেন। কিছুতেই নানকের মন সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না দেখিয়া পিতা কালু এই সময়ে সুলখনাচৌনীনাম্নী একটি বালিকার সহিত নানকের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর কিছুকাল নানক সুলখনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কালুর মনোরথ সিদ্ধ হইল না। বিবাহ করায় নানকের মনের গতি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না।

ঈশ্বর-প্রেম নানকের হৃদয় মন অধিকার করিয়া তাঁহাকে ভাবে

মাতোয়ারা করিয়াছিল। প্রেমের প্রথম আবির্ভাবে তিনি মৌনী হইয়া একস্থানে বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়াছিল। জননী ত্রিপতার অনুরোধে কালু চিকিৎসক ডাকিলেন। চিকিৎসক নাড়ী ধরিবামাত্র নানক বলিয়া উঠিলেন, নাড়ী খুঁজিতেছে কিন্তু ভ্রান্ত বৈদ্য জানে না যে, তাঁহার আপনার বুক দুঃখ-পরিপূর্ণ। হে বৈদ্য, তুমি যদি সুচিকিৎসক হও, তাহা হইলে কি রোগ হইয়াছে, আগে তাহা স্থির কর। সত্য সত্যই এমন ঔষধের প্রয়োজন,—যদ্দ্বারা সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া বিমল সুখের উদয় হয়। হে বৈদ্য, তুমি আগে আপনার রোগ দূর কর ; তাহা হইলেই বুঝিব তুমি সুচিকিৎসক। পিতা কালু নানককে বারংবার সংসারের কাজে লাগাইবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলই ফলে নাই। একবার তিনি পুত্রকে নুনের কারবারের জন্য টাকা দিয়াছিলেন। নানক ঐ টাকা ক্ষুধার্ত্ত সাধুদের সেবায় ব্যয় করেন। আর একবার নানক কোন এক সাধুকে একটি সুবর্ণ অঙ্গুরী ও একটি জলপাত্র দান করেন। পুত্রের এইরূপ সাধু সেবার জন্য অর্থব্যয় বিষয়ী পিতা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

গৃহতাড়িত নানক তাঁহার ভগিনীপতি জয়রামের মুদিখানায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সেখানে এক দিন এক সাধু হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবান্ আপনাকে অতি মহৎ কার্য্যের ভার দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, আপনার নাম 'নানক নিরাঙ্কারী'—আপনি পরব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন করিবেন, না মুদিখানার কার্য্যে জীবনপাত করিবেন ?"

নানক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য-সাধনের নিমিত্ত ফকির হইয়া বাহির হইলেন। তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ, সিংহল, মক্কা, পারস্য প্রভৃতি নানাদেশ ভ্রমণ করেন।

নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তখন একদিন তিনি

মস্‌জিদের দিকে পা দিয়া ঘুমাইয়াছিলেন ; ইহা দেখিয়া মন্দিরের প্রধান মোল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে জাগাইয়া বলিলেন, "তুমি কেমন বেয়াদব, ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছ ?" নানক উত্তর করিলেন, "হে মোল্লা, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। তুমি বলিতেছ, ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের দিকে পা প্রসারিত করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। আচ্ছা, বল দেখি, কোন্ দিকে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির নাই ? তাহা হইলে সেই দিকে আমার পা দু'খানি ফিরাইয়া রাখিব।" মোল্লা নানকের বাক্যের কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। মোগলসম্রাট্ বাবরের সঙ্গেও নানকের একবার দেখা হইয়াছিল। সম্রাট্ নানকের সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিস্তর পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন। নানক তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, দণ্ড কিংবা পুরস্কার আমি তাহারই নিকট হইতে গ্রহণ করিব, আর কাহারো নিকট হইতে চাই না।"

বাবা নানক ঈশ্বরপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসাহের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশ্বময় তিনি ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শত শত শ্লোকে ও শব্দে তিনি অনুভূত আশ্চর্য্য সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্মের আরতি রচনা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই,—"হে পরব্রহ্ম, পরমেশ্বরজি, গগনরূপ থালে রবিচন্দ্র প্রদীপস্বরূপ হইয়াছে, এবং তারকামণ্ডল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে ; বনরাজি উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপে তোমার কেমন আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দসকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন অথচ একটিও নয়ন নাই, সহস্র মূর্ত্তি, অথচ একটিও মূর্ত্তি নাই, সহস্র বিমল পদ, অথচ

একটিও পদ নাই, গন্ধ নাই, অথচ সহস্র তোমার গন্ধ ; এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র।”

“সহস্রের মধ্যে যে জ্যোতিঃ তাহা তাঁহারই জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। সাধক যখন তাঁহাকে ভক্তি করেন, তখনই তাঁহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি তাহারই জন্য তৃষিত। নানক-চাতককে কৃপাবারি প্রদান কর, সে যেন তোমার নামে নিত্য বাস করিতে পারে।”

রসস্বরূপের অনুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতে পরমভক্ত নানকের হৃদয় প্রেমে সরস হইয়া গিয়াছিল। সরল শিশুর মত তিনি কোমল-হৃদয় ছিলেন। এইরূপ প্রকাশ, দেশভ্রমণকালে রাস্তায় শিশুদের সহিত দেখা হইলে তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া শিশু হইয়া যাইতেন, তাহাদের খেলাধূলায় যোগদান করিতেন।

সন্ন্যাসীর বেশে নানক যখন প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন এক দিন বিপাশানদীর তীরে ক্রোড়ীরা নামক এক ধনি-সন্তানের সহিত তাঁহার দেখা হয়। নানকের অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া ক্রোড়ীরা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। ক্রোড়ীরা বিপাশাতীরে নানককে একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নানকের আদেশ-অনুসারে ক্রোড়ীরা ঐ নগরটির নাম “কর্ত্তারপুর” রাখিয়াছিলেন। ঐ নগরটি শিখদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্র হইয়াছে। “সাহাজাজ” অর্থাৎ নানকের বংশ এখনো এখানে বাস করিতেছেন।

নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া নানক স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার গৃহী হইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন—“কোরাণে, পুরাণে ও শাস্ত্রে ভগবান্ নাই ; ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতারা ঐ সকল শাস্ত্রে আপন আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ

করিয়াছেন ; শাস্ত্র-সমূহ ভ্রমে পরিপূর্ণ, ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া অনাবশ্যক। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ভগবান্ মিলিয়া-মিশিয়া রহিয়াছেন। পর্ব্বতগহ্বর-নিবাসী কঠোর যোগী ও রাজপ্রাসাদ-নিবাসী ধনবান্ দুইই তাঁহার চক্ষে তুল্য। কে কি জাতি, ভগবান্ কখন তাহার সন্ধান লইবেন না, সংসারে আসিয়া কে কি করিলেন, তাহাই তিনি দেখিবেন।” মোটামুটি হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও মূর্ত্তিপূজা এবং মুসলমানদিগের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গুরু নানক কোরাণ ও বেদ ভ্রমপূর্ণ বলিলেও কোনোটা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তিনি মুসলমানদিগের পর ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ও গোহত্যার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বোগ্‌দাদ্ নগরে অবস্থানকালে তিনি একদিন মুসলমানদের ডাক-নমাজের মন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একই ক্ষেত্রে উপাসনার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তথাকার মস্‌জিদের প্রধান মোল্লার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ চলিয়াছিল। তিনি মোল্লাকে বলিয়াছিলেন—“ভূলোকে, দ্যুলোকে যিনি নিত্যকাল বিরাজিত, একমাত্র সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে আমি স্বীকার করি—কোনো সম্প্রদায়ের দেবতাকে স্বীকার করি না।”

নানকের একটি উক্তিতে তাঁহার ধর্ম্মমতের উচ্চতা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেনঃ—“লক্ষ লক্ষ মহম্মদ, কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু, সহস্র সহস্র রাম, সেই মহান্ পরব্রহ্মের মন্দিরের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহাদের সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর। সকলেই তাঁহার গুণগান করেন বটে, কিন্তু আপন আপন মত লইয়া বিরোধ করিতে লজ্জা অনুভব করেন না। ইহা হইতেই ::।যায় যে, তাঁহারা অসদ্‌বুদ্ধির দ্বারা পরাভূত হইয়াছেন।

তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত মুসলমান, যিনি পবিত্র।”

বাবা নানকের সার্ব্বভৌমিক সাধনা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিল। “ভগবান্ এক, মানুষ ভাই ভাই” এই সত্যটিই তিনি প্রচার করিতেন। তিনি নিজেকে মৃত্যুশীল, পাপী মানব বলিয়াই মনে করিতেন। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের প্রতি বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন। আদি গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—“মানুষ বেদ ও কোরাণ পাঠ করিয়া সাময়িক আনন্দ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ না করিলে কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।” কোনো অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ড দেখাইয়া তিনি কদাচ কাহাকেও ভুলাইতেন না। কেহ তাঁহাকে অলৌকিক কিছু দেখাইতে বলিলে, তিনি বলিতেন, “আমি কেবলমাত্র পবিত্র ধর্ম্মের কথা জানি, আর কিছু জানি না। একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সব অস্থায়ী।”

শেষ জীবনে বাবা নানক সপরিবারে বিপাশা নদীর তীরে কর্ত্তারপুরে বাস করিতেন। তখন নানাস্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, মধুর বচন ও সরল সৌজন্য সকলকে মোহিত করিত। তিনি হিন্দুকে উপদেশ দিবার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন, কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া মুসলমানদিগকে উপদেশ দিতেন। এইরূপ ভক্ত-সমাগমে নানকের বাসভূমি কর্ত্তারপুর পরম তীর্থ হইয়া উঠিল—দলে দলে লোক আসিয়া তথায় পুণ্য ও শান্তি লাভ করিত।

নানকের সহচর ভক্তদিগের মধ্যে মর্দ্দানা ও বালসিন্ধু বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তুঙ্গ গ্রামের রামদাস নামক এক রাখালও তাঁহার সহচর ছিলেন। নানকের আশ্চর্য্য শক্তিতে ও ভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনি

তাঁহার চির অনুগত হইয়াছিলেন। রামদাস বয়সে অতি প্রাচীন ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে 'বুড্ডা' বলিয়া ডাকিত।

নানকের সহচরদিগের মধ্যে লহিনা ধর্ম্মসাধনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। শ্রদ্ধাভক্তিতে ও ধর্ম্মপ্রাণতায় তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া, নানক তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। পরলোকগমনের পূর্ব্বে তিনি লহিনাকে "গুরু অঙ্গদ" নাম দিয়া গুরুর পদে বরণ করিয়া গিয়াছিলেন।

লহিনা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। পর্ব্ব-উপলক্ষে কাংগ্রায় বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার সময়ে তিনি পথিমধ্যে গুরু নানককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। গুরু নানকের সুমধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মহাত্মা নানক দীর্ঘকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসের দশমীর দিনে ৭১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

কবীর

মহাত্মা কবীরের জীবন হিন্দু ও মুসলমান সাধনার পবিত্র সঙ্গমতীর্থ। অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রভাবে তিনি উভয় ধর্ম্মের সার সত্য অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুও নহেন মুসলমানও নহেন, অথচ দুই দলের লোকেরাই তাঁহাকে আপন আপন দলে টানিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভক্তির যে উদার রাজপথে সম্প্রদায় ভুলিয়া গোঁড়ামি বর্জ্জন করিয়া হিন্দু ও মুসলমান একই জননীর যুগল পুত্রের ন্যায় গলাগলি দাঁড়াইতে পারেন, সেই উন্মুক্ত সদর রাস্তায় কবীর সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

যে রাম হিন্দুর নিজস্ব, যে রহিম মুসলমানের নিজস্ব, সেই রামকে, সেই রহিমকে তিনি অস্বীকার করিয়া সকলকে সত্যজ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সত্যদেবতা সত্যের মধ্যেই বিহার করেন, তাঁহার আবির্ভাবেই মিথ্যা পলায়ন করিয়া থাকে। কবীর হিন্দুর হিন্দুয়ানী মুসলমানের মুসলমানী দেখিয়া মনের খেদে বলিয়াছেন—"হিন্দু বলেন আমার রাম, মুসলমান বলেন আমার রহিম, পরস্পর মারামারি করেন; অথচ মর্ম্মকথা কেহই বুঝিলেন না। * * * * তাঁহাদের জ্ঞান স্থূল, কারণ তাঁহারা পরমাত্মাকে ছাড়িয়া পাষাণকে পূজা করেন। কেহ বা পিত্তলমূর্ত্তি পাষাণমূর্ত্তি পূজা করেন, কেহ তীর্থব্রতে ভ্রান্ত রহিয়াছেন, কেহ মালা ধারণ করেন, কেহ টুপী পরেন, কেহ তিলক ধারণ করেন, দোঁহাজপ করেন, ভজন গাহিয়া থাকেন, কিন্তু পরমাত্মাকে জানেন না। ঐ যে মিথ্যা অভিমানে মত্ত হইয়া



ধক কবীর

ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়া ফিরিতেছেন, ঐ গুরু শিষ্যের সহিত রসাতলে যাইতেছেন। পীর ফকিরও বহুত দেখিয়াছি, কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ কেহ বা কোরাণ পড়েন, তাঁহারা সকলেই শিষ্য করেন, গুপ্তবার্ত্তা বলেন, অথচ ঈশ্বর জানেন না। হিন্দুর দয়া মুসলমানের করুণা উভয়ের ঘর হইতে পলাইয়াছে। একজন বলি দেয়, অন্যজনে জবাই করে—উভয়ের ঘরেই আগুন লাগিয়াছে।”

যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই, যিনি জাতি কুল আচার বিচারের দম্ভাহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকেন, তিনি আপনার চারিদিকে অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া আপনাকেই বড় হইতে ভূমা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন। মহাত্মা কবীর প্রেমসাধনা দ্বারা ভক্তির এমন উচ্চ গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রবেশাধিকারই থাকিতে পারে না। সেইখান হইতেই তিনি কহিয়াছেন, “আমার বাণী আমার জাতি, হৃদয়েশ্বর আমার কুল, সাধুরা আমার জ্ঞাতি।”

এমন অবস্থালাভের নিমিত্ত কবীরকে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কবীরের উপদেশে এইরূপ সংগ্রামের বর্ণনা রহিয়াছে। “খড়্গ লইয়া সংগ্রামে প্রবেশ কর। হে ভ্রাতঃ, দেহপাতপর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া শত্রুকে সেই খানেই পরাস্ত করিয়া প্রভুর দরবারে আসিয়া মস্তক অবনত কর। বীর কখনও সংগ্রাম করিয়া পলায়ন করে না। যে পলায়ন করে, সে কখনই বীর নহে। কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভের সহিত এই দেহ-ক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে। শীল এবং সত্যসন্তোষের রাজ্যমধ্যে এই যুদ্ধ চলিয়াছে; নামখড়্গ সেখানে খুব ধ্বনিত হইতেছে। কবীর কহেন, যদি কোন বীর যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, তবে সেই কাপুরুষের ভিড় এক নিমিষে পলায়ন করে। সাধকের যুদ্ধ অতি ভীষণ, অতি দুষ্কর।

সতী ও বীরের অপেক্ষা সাধকের ব্রত অনেক দুরূহ। বীরের যুদ্ধ দুই চারি দণ্ডের, সতীর যুদ্ধ দুই এক পলকের। সাধকের সংগ্রাম দিবারাত্রি চলিয়াছে, যতকাল কায়া আছে ততকাল সেই যুদ্ধের অবসান নাই।"

এই তো গেল সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধকদের সংগ্রাম। যেমন অন্তরে এই তুমুল যুদ্ধ, তেমনি বাহিরেও ভীষণ প্রতিকূলতা কবীরকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কাশীর নিকটবর্ত্তী লহরতলাও-নামক এক ক্ষুদ্র জনপদে মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের জন্ম। কেহ কেহ বলেন, তিনি এক ব্রাহ্মণবিধবা যুবতীর পুত্র, জন্মমাত্র জননী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী হিন্দুশিষ্যেরা কবীরকে হিন্দুদলে টানিবার নিমিত্ত এই আখ্যান সৃষ্টিও করিতে পারেন। যে মুসলমাননারীর অঙ্কে কবীর বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার সেই জননী নিমার নিকটে তিনি দুর্ব্যবহারই পাইয়াছিলেন। মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াও বাল্য-কাল হইতেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি কবীরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুসেবা করিয়া অতুলানন্দ লাভ করিতেন। জননী নিমার ইহা সহ্য হইত না। তিনি পুত্রকে এইজন্য নিয়ত ভর্ৎসনা করিতেন। শৈশবেই কবীরের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগরিত হইয়াছিল; হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ বারাণসীধামের অতি সন্নিকটে বাস করিতেন বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোনও কারণে হউক, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার চরিত্রের উপর অতি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাল্য-বয়সেই তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক "রাম" "হরি" প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতেন। এই জন্য মুসলমান সঙ্গীরা তাঁহাকে অবিশ্বাসী বিধর্ম্মী বলিয়া উপহাস করিত। তিনি তিরস্কৃত ও উপহসিত হইয়া কদাচ ধৈর্য্য হারাইতেন না, সঙ্গীদিগকে গম্ভীরভাবে কহিতেন, "যাহারা বিনা কারণে

অন্যকে আঘাত করে, লোককে প্রতারিত করিবার জন্য ধার্ম্মিকের পোষাক পরে, মদ্যপান দস্যুতা ও নরহত্যা করিয়া থাকে, তাহারাই অবিশ্বাসী বলিয়া কথিত হইতে পারে।”

কবীরের বাল্যজীবন-সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, প্রচলিত মুসলমানধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। পরন্তু ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় “হিন্দুর রাম”কে আপনার করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে হিন্দু-আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ পরিজনদিগের—বিশেষতঃ জননী নিমার গভীর দুর্ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কখন বলিতেন, “তুই প্রত্যহ ভোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পাকপাত্র আন্‌বি, এবং স্বহস্তে গৃহ মার্জ্জনা 'কর্‌বি—এই করিয়াই তোর জীবন কাটিয়া যাইবে—কাপড় বুনানের দিকে তোর একটুও মন নাই, কেবল দিনরাত ‘রাম’ ‘রাম’ করিস্, আমাদের জাতিতে কে কবে ‘রাম’ নাম করিয়া থাকে।” আবার কখন পুত্রের ব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া পরিজনদিগকে ডাকিয়া কহিতেন, “ওরে, তোরা শোন্ আমাদের এই অপদার্থ ছেলেটা যেদিন জপের মালা ধরিয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের সংসারের শান্তি চলিয়া গিয়াছে। এই ছেলেটা আমাদের কাপড়ের ব্যবসায় মাটি করিয়াছে ; এই পাপটার মরণও নাই।”

শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থেও প্রকাশ, মহাত্মা রামানন্দস্বামীর শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর “রাম” নাম কবীরের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। তথায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

“সেই রাম নাম মহামন্ত্র যে জানিঞা।
হৃদয়-সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া॥

গৃহকর্ম্ম জাতি-পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসী-মালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে॥
আপন ইমান ছাড়ি নৈলি হিন্দুধর্ম্ম।
কে তোরে শিখালো করিবারে হেন কর্ম্ম॥"

এই কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতার মধ্যে আমরা সাধক কবীরের ধর্ম্ম-সাধনার ক্ষীণ সূত্রপাত দেখিতে পাই। প্রথমে তিনি "তিলক" "মালা" ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনিই বলিয়াছেন,—"মালাই ফিরাও, তিলকই লাগাও, লম্বা জটাই বাড়াও, অন্তরে তোমার শাণিত খড়্গ, এমন করিয়া ঈশ্বর মেলে না।" সাধনার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধককে আপনার অন্তরের বাধা দূর করিতে হয়। কবীর বলেন,—"যে জন মন হইতে আপনাকে দূর করিয়াছে সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।" ব্রতপালন, যোগসাধন প্রভৃতি দ্বারা মানুষ আপনার ক্লেশেরই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আত্মার ভ্রান্তি যখন দূর হয়, গর্ব্ব অভিমান যখন চলিয়া যায়, তখনই কর্ম্মবন্ধন শক্তিহীন হইয়া থাকে—তখনই মানুষ নিজপদে উন্নীত হইয়া থাকে।"

কবীরের হৃদয়ে যে দেবতা রমণ করিতেন, তিনি তাঁহাকেই "রাম" বলিতেন, তিনি কহিয়াছেন,—"সেই অদ্বিতীয় প্রভু রামই আমার সর্ব্বসুখের আকর। আমার আত্মা তাঁহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গুরুর কৃপায় আমি অধ্যাত্মজ্ঞান ও জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি। আমি সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই মনন করি। আমার সকল গ্রন্থি সকল ভয় ছিন্ন হইয়াছে, আমার আত্মা আনন্দরস লাভ করিয়াছে। আনন্দের ভাবে আমার মন ঈশ্বরের চরণে প্রণত হইয়া রহিয়াছে, অন্য ভাবনা আমায় অধিকার করিতে পারে না।"

এই দেবতাকে লাভ করিবার জন্য কবীর সাধনার প্রারম্ভে বাহ্য অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে তিনি দীর্ঘকাল আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন,—"তীর্থ তো কেবল জল—তাহাতে কোন ফল নাই—তাহা আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি। প্রতিমাগুলি তো জড়, কোন কথাই বলে না—আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। পুরাণ কোরাণ তো কেবল কথা, যবনিকা সরাইয়া আমি দেখিয়াছি। কবীর কেবল অনুভবকথা কহিতেছে—আর সব যে শূন্য ও অন্তঃসারবিহীন তাহা সে বেশ জানে।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—"ভগবান্ যদি মস্জিদেই রহিলেন, তবে ইহার বাহিরে যে বিশ্বটা রহিয়াছে তাহা কাঁহার? হিন্দুরা বলেন, তিনি মূর্ত্তিতে আছেন। আমি এই দুই সম্প্রদায়ের কোনোখানে সত্যস্বরূপকে পাইলাম না। হে পরমেশ্বর, তুমি আল্লাই হও, আর রামই হও, তোমার নামকেই আশ্রয় করিয়াই আমি জীবিত আছি।" কবীর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনাকে তাঁহার শ্রীচরণে, নিবেদন করিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"প্রিয়তমের কথাই আমার ভাল লাগে, অন্য প্রকারের অশেষ সান্ত্বনার বাণীতেও আমার মন স্থির হয় না।"

জগদীশ্বর যখন প্রেমিক কবীরের নিকট একান্ত সহজ হইয়া গেলেন, তখন তিনি বলিলেন,—"স্বামীর সহিত যে দিন আমার মিলন হইয়াছে, সেই দিন হইতে প্রেমলীলার আর অবসান নাই। আমি চক্ষু মুদি না, কর্ণ রুধি না, দেহকে কোন কষ্ট দেই না। নয়ন খুলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে দেখি, এবং সর্ব্বত্র সেই সুন্দররূপ দেখিতে পাই। সেই নামই বলি, যাহা শুনি তাঁহাকেই স্মরণ করি ; যাহা কিছু করি, সেই পূজা, উদয় অস্ত আমার কাছে এক, সব দ্বন্দ্ব মিটিয়াছে। যেখানে যাই তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করি, যাহা করি সেই তাঁর সেবা, যখন

শয়ন করি তখন তাঁহার চরণে প্রণত হই, অন্য পূজনীয় আমার নাই। রসনা আমার মলিন বচন ত্যাগ করিয়াছে, সে দিনরাত্রি তাঁহারই গান গায়। উঠিতে বসিতে কখন বিস্মৃত হইতে পারি না, আমার কর্ণে তাঁহার গানের তাল এমনি বাজিতেছে।”

এই যে পাওয়া, যে পাওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাওয়া আর নাই, তাহাকে পাইয়া নিরক্ষর কবীর সকলই পাইলেন। অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক-দিগের নিকট যাহা দুর্ব্বোধ, জোলার কাছে তাহা একান্ত 'অনায়াস হইয়া গেল। অসীমকে একান্ত সহজে লাভ করিয়া তিনি তাঁহার সেই পাওয়ার সংবাদ কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যভাবেই বলিয়াছেন,—“অসীমে আমার আসন করিয়াছি, অগম্য পেয়ালা পান করিয়াছি, রহস্যকে জানিয়া যোগের মূলকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিনা পথেই সেই দুঃখহীন অগম্যপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সহজেই সেই জগদেবের দয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অগম্য অগাধ বলিয়া সকলে যাঁহাকে গাইয়াছে, ধ্যান করিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি। বিনা নয়নে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের খেলা দেখিয়াছি, জগতের ভ্রম আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। বাহিরে ভিতরে একই আকাশের ন্যায়, সীমার মধ্যে অসীম পরিপূর্ণরূপে লাগিয়াছে। সেই উৎসবের দৃশ্য দেখিয়া মত্ত হইয়াছি। হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার জ্যোতিঃ সকল জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে; জ্ঞানের থালার উপর প্রেমের দীপক জ্বলিয়াছে। নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নে নয়নে নানা রূপ ধরিতেছেন, তিনি নিরাকার নিগুর্ণ অবিনাশী, অপার অতল তাঁহার রূপ, তিনিই মহানন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন এবং রূপের তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই মহানন্দের সংস্পর্শে তনুমন আর স্থির থাকিতে পারে না। সকল চৈতন্যের মধ্যে সকল আনন্দের মধ্যে সকল দুঃখের মধ্যে তিনি মগ্ন হইয়া আছেন। কোথায় আদি, কোথায়

অন্ত, সমস্তই তিনি আপনার আনন্দের মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন। জাগিয়া উঠিতেই আমি সেই যোগেশ্বরকে পাইয়াছি, আমার জীবনের দেবতা যোগেশ্বরকে জাগিয়াই দেখিতে পাইয়াছি। অচল সেই অলক্ষ্য পুরুষের ধাম, শীতল তাহার ছায়া। নৃত্য কর আমার মন, মত্ত হইয়া নৃত্য কর। প্রেমের রাগিণী দিনরাত্রি বাজিতেছে, সবাই সেই সঙ্গীত শুনিতেছে। রাহুকেতু নবগ্রহ নৃত্য করিতেছে, গিরিসমুদ্রধরিত্রী নৃত্য করিতেছে, হাস্যক্রন্দনে নিখিল লোক নাচিতেছে। ছাপাতিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া জগৎ হইতে কেন দূরে রহিয়াছ? এই দেখ সহস্র কলায় আমার মন নৃত্য করিতেছে, সৃজনকর্ত্তা তাহাতেই পরিতৃপ্ত।”

গন্ধ যেমন আপনাকে বায়ুতে মিলাইয়া দেয়, জলপ্রবাহ যেমন আপনাকে অতল সমুদ্রে মিশাইয়া দেয়, সীমাও তেমনি আপনাকে অসীমের মধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এই স্বাভাবিক মিলনের পর আর বিচ্ছেদের কথাই উঠিতে পারে না। এমনি যোগযুক্ত হইয়াই কবীর বলিয়াছেন,—“তোমাতে আমাতে যে প্রেম তাহা ছিন্ন হইবে কেমন করিয়া? কমলপত্র যেমন জলেই বাস করে, তেমনি তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার দাস; যেমন চকোর সকল রাত্রি চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার সেবক। আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত তোমাতে আমাতে প্রেম: এখন সে মিলনের অবসান কেমন করিয়া হইবে।” এই সহজ মিলনের নিবিড়তা অনুভব করিয়াই তিনি বলিয়াছেন,—“যে যাহা খুসী বলুক, আমি বাঁধা পড়িয়াছি যেখানে, সেইখানেই রহিলাম। প্রেম-কমলে আমার মন মজিয়াছে, প্রিয়তমের প্রেমকটাক্ষ আমি পাইয়াছি। সাংসারিক বিচার ছাড়িয়া দিয়াছি, তাঁহার বাণীতেই আমি সটকাইয়াছি। কবীর তাঁহার প্রিয়তমের ঝুলনে জন্মমরণ বিস্মৃত হইয়া ঝুলিতেছে।”

কবীর তাঁহার প্রিয়তম মহান্ পুরুষের প্রেমসাগরে ডুব দিয়া জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়াছিলেন ; তিনি সেই প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া কোথায় গিয়াছিলেন কে জানে ? সেই অসীম অতলের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া তিনি সাধু গোরক্ষকে কহিয়াছেন,—"ব্রহ্মা যখন মুকুট ধারণ করেন নাই, বিষ্ণু যখন রাজটীকা ধারণ করেন নাই, শিবশক্তি যখন জন্মেনও নাই তখনই আমি যোগশিক্ষা করিয়াছি। কাশীতে আমি প্রকাশিত হইয়াছি, রামানন্দ সচেতন করিয়াছেন, 'অসীমের তৃষ্ণা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, মিলন করিতে আমি আসিয়াছি।" কবীর তাঁহার মিলনের অপূর্ব্ব আনন্দ সাধু ধর্ম্মদাসের সমীপে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রিয়তম আমার ঘরে আসিয়াছেন। চন্দনে অগুরুতে মন্দির আমার সুবাসিত হইয়া উঠিল, অঙ্গন আমার কুসুমে কুসুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শুভ্র সিংহাসনে প্রিয়তম আমার উপবিষ্ট ; প্রেম ও বৈরাগ্য দ্বারা আমি তাহা দেখিয়াছি। প্রিয়তমের প্রেমের বলেই তো এই দর্শন লাভ হইল, জীবন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার ঘরে আমার অঙ্গনে আজ কি আনন্দ, প্রেম আজ পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুর্লভ অমৃতরস আজ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রিয়তম যে আমার নিকটে, প্রিয়তম তো দূরে নহেন।"

এমনভাবে প্রেমস্বরূপের প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারই প্রসন্নদৃষ্টির সম্মুখে এই মহাত্মা প্রতিদিন সংসারের ছোট বড় সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতেন। তিনি ধর্ম্মসাধনার জন্য ঘর ছাড়িয়া বনে পলায়ন করেন নাই—পলায়নের প্রয়োজনীয়তাও কোনোদিন স্বীকার করেন নাই। তাঁহার নির্ম্মল গার্হস্থ্যজীবনই এই প্রকার সংসারবিমুখতার উজ্জ্বল প্রতিবাদ। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী ছিলেন বলিয়া সংসার তাঁহার সাধনার অনুকূলতাই করিয়াছে। সকল স্নেহভালবাসার মূলে তিনি সেই রসস্বরূপকে দেখিতেন বলিয়াই পারিবারিক সম্বন্ধগুলি তাঁহার

নিকটে মধুরতর হইয়াছিল। পুত্ররূপে পুত্রীরূপে সন্তান যখন তাঁহার গৃহে ভূমিষ্ঠ হইল, তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাগ্যের পরিপূর্ণতা বলিয়া "কমাল" "কমালী" নাম দিলেন, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র মায়ার পুত্তলি বলিয়া উপেক্ষা করিলেন না।

কবীর কখনো উদাসীনের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, কাপড় বুনিয়া দিনপাত করিতেন। স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কখনও তিনি অনুভব করেন নাই। তিনি বলেন,—"ঘরের মধ্যেই যোগ, ঘরের মধ্যেই ভোগ, ঘর ছাড়িয়া কেন বনে যাও? ব্রহ্ম যদি তত্ত্ব দেখাইয়া দেন তবে দেখিব যে, ঘরেই যুক্ত ঘরেই মুক্ত।" গৃহত্যাগের প্রতিবাদ করিবার জন্যই তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"গার্হস্থ্য ছাড়িয়া উদাসীন হইল, তপস্যার জন্য বনখণ্ডে গেল, দেহকে ক্লান্ত করিয়া মারিল, বাছিয়া বাছিয়া জঙ্গলী কুল খাইতে লাগিল।"

কঠোর বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া কবীর আপনার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করেন নাই। প্রেম ও বৈরাগ্য এই দুইকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজ অশ্রুমুক্তায় আমার নয়ন ভরিয়া আসিতেছে। তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া, প্রেমরস পান করিয়া, আমার সকল সাধনা আজ সার্থক করিব। আজ আমার ঘরে পাঁচসখী (ইন্দ্রিয়) মঙ্গল গাহিতেছে তাঁহার প্রেমের সুরে তাহারা সুর মিলাইয়াছে।"

এই মহাসাধকের সাধনার সহিত তৎকালপ্রচলিত কোনো সাধনারই ঐক্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামানন্দের শিষ্যদলের ন্যায় তিনি সংসারত্যাগী ছিলেন না। তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, ত্যাগী হইয়াও ভোগী ছিলেন। স্ত্রী-পুত্রে পরিবৃত হইয়া সংসারের মাঝখানে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। যে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, প্রেমযোগে সহজেই কবীর তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে লাভ

করিবার জন্য ছুটাছুটির, অসাধ্য-সাধনের কোনো দরকার নাই, এই কথাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন।

এই নিরহঙ্কার প্রেমিকের সাধুতা বালবৃদ্ধ নরনারী সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মমতের উদারতা না বুঝিয়াও দলে দলে লোক মধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার চরণপ্রান্তে সম্মিলিত হইত। ভক্ত কবীরের হৃদয়-পদ্মের দিব্যসৌরভে কাশীবাসী সকলে বিমোহিত হইল। উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র হিন্দুমুসলমান প্রত্যেকেই এই মুসলমান জোলার চরণরেণু অঙ্গে মাখিয়া আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিত। তাঁহার বিনয়মণ্ডিত সরল ব্যবহার ও অপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিত। কবীরের এই সম্মান জাত্যভিমানী এক দল ব্রাহ্মণের সহ্য হইল না। তাঁহারা এই সাধুকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণদল এক পতিতা নারীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া কবীরের নিকটে পাঠাইলেন। ঐ মুখরা নারী প্রকাশ্য হাটের মাঝখানে আপনাকে কবীরের অনুগতা বলিয়া ব্যক্ত করিল। কবীর শত্রুব্যূহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সেই পতিতাকে ভগবানের দান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কিয়ৎকালের জন্য চতুর্দ্দিকে তাঁহার নিন্দা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সাধারণলোকদের কেহ কেহ তাঁহাকে ভণ্ড মনে করিয়া ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণেশ্বর তাঁহার নিকটে আরও ঘনিষ্ঠতর হইলেন। সাধুর পুণ্যসঙ্গে পতিতা নারীর দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল এবং অত্যল্পকালমধ্যেই কুচক্রীদের সকল চাতুরী ব্যর্থ হইল।

কবীরের অভ্যুদয়কালে সিকন্দর সাহ লোদী দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছিল যে, কবীর কাশীবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে কুপথগামী করিতেছেন।

ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ এই অপরাধে ভক্তের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান করেন; অনন্যসুলভ সহিষ্ণুতার সহিত কবীর সেই শাস্তি বহন করিয়াছিলেন। আবার একবার সম্রাট্ ভক্ত কবীরকে সামান্য অপরাধিজ্ঞানে দণ্ডদান করিয়াছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ এমন অসামান্য ধৈর্য্যের সহিত সেই কঠিন দণ্ড গ্রহণ করেন যে, তাঁহার সেই সহিষ্ণুতা দর্শনে সম্রাটের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং কহিলেন,—"আমি আপনার দাসানুদাস, আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন, আমি যেন আপনার কৃপায় ইহলোকে ও পরলোকে শান্তিলাভ করিতে পারি। আপনি রাজ্যৈশ্বর্য্য যাহা কামনা করিবেন তাহাই আপনাকে প্রদান করিব।" কবীর কহিলেন,—সোনারূপা জমাজমি আমি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নাম ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার লোভ নাই।

যেমন জীবনে তেমনি মৃত্যুতেও কবীর তাঁহার সংস্কারবিমুক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, কাশীতে মরিলে শিবত্ব লাভ হয়। মৃত্যু দ্বারা এই কুসংস্কার খণ্ডন করিবার জন্যই তিনি মরিবার পূর্ব্বে কাশীর নিকটবর্ত্তী বস্তীজেলার মগহর নামক এক অনুর্ব্বর জনপদে গমন করেন। কবীর বলিয়াছিলেন,—"জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, জোলাও তেমনি পরমেশ্বরে মিশিয়া যাইবে।"

কবীর কোনো সম্প্রদায়ের নহেন বলিয়া মৃত্যুর পরও তাঁহাকে লইয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই টানাটানি করিয়াছেন। কাশীরাজ বীরসিংহ নিজ রাজধানীতে এবং মুসলমানদলপতি বিজিলি খাঁ মগহরে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। লহরতলাও হ্রদের তীরেও কবীরের স্মৃতিতে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় আজপর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের নরনারী এই ভক্তকে অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন।

কবীর অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা-দিনে তাঁহার জন্ম; ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীর উপবাস-দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবিদাস

ভক্ত বলিয়াছেন, "আমি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিলাম, কিন্তু আমারই বুদ্ধির দোষে এই জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভগবানে যদি আমার রতি না জন্মিল, তাহা হইলে আমি ইন্দ্রের সিংহাসন পাইলেই কি, কিংবা রাজপ্রাসাদ লাভ করিলেই বা কি? হায়, সমস্ত সুখলালসা ভুলিয়া আমি নাম-রসে মজিতে পারিলাম না! যাহা আমার জানা উচিত ছিল, তাহা জানিলাম না; আমি উন্মত্ত হইয়াছি, যাহা আমার চিন্তনীয় তাহা ভাবিলামই না। ওদিকে আমার দিন তো শেষ হইয়া আসিল। হায়, ভাবি এক, করি আর; সাংসারিক সুখকামনা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল! হে প্রভো, তোমার দাসের হৃদয় এই বেদনায় কাতর হইয়াছে। তুমি তোমার দাসকে দূরে রাখিয়া দুঃখ দিও না, তাহাকে করুণা কর।"

এই উক্তিটির মধ্যে পরম ভাগবত রবিদাসের সাধন-জীবনের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। সাধু রবিদাসের বাসভূমি কোথায়, কে তাঁহার পিতা, কে তাঁহার মাতা, আমরা তাহা অবগত নহি। সে সংবাদ না জানিয়া আমাদের কোনো ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাত্মা কবীর সাধুবন্দনাকালে বারংবার বলিয়াছেন, সাধুদের মধ্যে সাধু রবিদাস। ভক্ত রবিদাস ভক্ত-সমাজের বন্দনীয় পরমভক্ত, ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। তিনি যে পিতার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই ঘরে দীর্ঘকাল বাস করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। তিনি স্বভাবতঃ বিরাগী ছিলেন এবং সাধুর পরিতোষের নিমিত্ত মুক্তহস্তে অর্থ

ব্যয় করিতেন বলিয়া, তাঁহার সংসারী পিতা তাঁহাকে স্বগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বাসের নিমিত্ত একখানি কুটীর পাইলেন মাত্র, পিতার ধনসম্পদের অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

ইহাতে রবিদাসের কোনো দুঃখ হইল না, সম্পদের প্রতি তাঁহার কখনও লোভ ছিল না। তিনি জাতিতে মুচি ছিলেন। প্রত্যহ তিনি দুই জোড়া পাদুকা প্রস্তুত করিতেন, এক জোড়া বিনা মূল্যে সাধু বৈষ্ণবের চরণে পরাইয়া দিতেন, অপর জোড়া বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন তদ্দ্বারা প্রসন্নচিত্তে সস্ত্রীক দিনাতিপাত করিতেন। শ্রীভক্তমালগ্রন্থের অনুবাদক শ্রীমৎকৃষ্ণদাস বাবাজী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

"দুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
এক জুড়ি দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া॥
এক জুড়ি বেচি করে দেহ-নির্ব্বাহণ।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন॥"

বাহিরের এই দীনদরিদ্র মানবটি অন্তরের সম্পদে কত বড় ধনী ছিলেন, পাপতাপদম্ভাহঙ্কার-কলুষিত সাধারণ মানব তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? রত্নের মূল্য বোঝে সে, যে প্রকৃত জহরী। এইরূপ কথিত আছে যে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাত্মা রামানন্দ যখন ভাবাবেশে তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রেমাঞ্জনলিপ্ত দিব্য নয়নে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছিলেন। রবিদাস ইঁহাদের অন্যতম। রবিদাস তাঁহার কুটীরের সম্মুখস্থিত রাস্তার আবর্জ্জনা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিক সাধু রামানন্দ তাঁহাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি কে?" বিস্মিত রবিদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সবিনয়ে কহিলেন,—"আমি এক অধম মুচি।" রামানন্দ কহিলেন,—"তোমাকে সাধনা করিতে হইবে।" রবিদাস কহিলেন,—"আমি অতি নীচ; আমার পক্ষে কি ইহা সম্ভব?" রামানন্দ কহিলেন,—"দেখ রবিদাস, তোমাকে কেবলমাত্র

বাহিরের রাস্তার আবর্জ্জনা ঝাঁট দিলে চলিবে না, ধর্ম্মের পথে অনেক জঞ্জাল জমিয়া উঠিয়াছে, সাধনা দ্বারা তোমাকে সেই জঞ্জাল দূর করিতে হইবে—তুমি আর বিলম্ব করিও না, তোমার ডাক পড়িয়াছে।” সম্ভবতঃ পরম ভাগবত রামানন্দের প্রেমকিরণসম্পাতে রবিদাসের চিত্তশতদল এই সময়ে বিকশিত হইয়াছিল। চুম্বকস্পর্শে লৌহ চুম্বকত্ব লাভ করিয়াছিল।

রবিদাসের বাহিরের জীবন-কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। ভগবানের গভীর ধ্যানে ও সাধু-সেবায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। দরিদ্রতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। কষ্টেসৃষ্টে কোনো মতে তাঁহার জীবিকা চলিয়া যাইত। ভগবানের অনুগ্রহে উপবাস করিতে হইত না, এই-মাত্র। এই দীনদরিদ্র যে ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র, লোকে তাহা জানিত না, সাধারণ লোকে তাঁহাকে উপেক্ষাই করিত। শ্রীভক্তমালগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ঃ—

“রুইদাস বাল নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপাপাত্র কেহ না জানয়।”

পরীক্ষার তীব্র অনলে পোড়াইয়া ভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রেম বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন। ভক্ত রবিদাসকেও সেইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। একদিন এক সাধু তাঁহার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। রবিদাস সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার সেবা করিলেন। সাধু একখণ্ড স্পর্শমণি বাহির করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া রবিদাসকে উপহার দিতে চাহিলে, তিনি কিছুতেই সেই দান গ্রহণ করিবেন না, সাধুও স্পর্শমণি তাঁহাকে না দিয়া ছাড়িবেন না; অবশেষে রবিদাস বিরক্তি-সহকারে কহিলেন, “আপনার অভিরুচি হইলে আপনি উহা ঐ চালের তৃণের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া যান।” রবিদাস মণি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি একটি সঙ্গীতে কহিয়াছেন,—“ভগবানের নামই তাঁহার সেবকদিগের পরম সম্পদ্; সেই সম্পদ্ দিনের পর দিন

4

বাড়িতে থাকে, কিছুতেই তাহার ক্ষয় হয় না। কি দিনে, কি রাত্রিতে কেহ ইহা হরণ করিতে পারে না। এই সম্পদের যিনি অধিকারী তাঁহার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই, তিনি নিরাপদে আপন ঘরে ঘুমাইতে পারেন। হে পরমেশ্বর, যাঁহাকে তুমি এই ধনের অধিকারী করিয়াছ, মণিতে তাহার কোন্ প্রয়োজন?" এই প্রসঙ্গে শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে মন্তব্য করা হইয়াছে ঃ—

"প্রেমানন্দ-রত্নে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায় ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে যাথে অতি তুচ্ছ বুদ্ধি ॥
সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশরতন।
নিত্যানন্দপূর্ণ যার সদানন্দ মনি ॥"

তের মাস পরে আবার সেই সাধু রবিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রবিদাসের দারিদ্র্য বিন্দুমাত্র দূর হয় নাই, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কাঙ্গালই আছেন। তিনি রবিদাসকে প্রশ্ন করিলেন,—"সেই স্পর্শমণির কি করিয়াছ?" রবিদাস কহিলেন, "আমি উহা স্পর্শ করিতে ভীত, আপনি উহা যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানেই আছে।" সাধু বিস্মিত হইলেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, রবিদাসের হৃদয়ে ধনলালসা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে, রবিদাস একদিন ঠাকুরের আসনতলে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিলেন; তিনি ঐ অর্থের কি করিবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ভগবানের আদেশে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় ব্যয় করেন। এই সময়ে তিনি এক ধনী ভক্তের নিকটে প্রভূত অর্থ পাইলেন এবং উক্ত অর্থ দ্বারা তিনি ঠাকুরমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ বৈষ্ণব-সেবার

ব্যবস্থা করিলেন। রবিদাসের দারিদ্র্য দূর হইল। তাঁহার পুণ্যভবনে এখন ঃ—

"সদা গান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অন্য রব॥"

সাধনে ভজনে কীর্ত্তনে ধ্যানে মহোৎসবে রবিদাসের দিন কাটিতে লাগিল। রবিদাসের এই হঠাৎ বৃদ্ধি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দাম্ভিক ও জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণের দল এই মুচির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণদল কাশীর রাজার নিকটে রবিদাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপন করিল যে, মুচি হইয়া সে স্বহস্তে ঠাকুর পূজা করে। শাস্ত্রানুসারে সে এই অধিকার পাইতে পারে না এবং এই দাম্ভিকতার জন্য তাহার দণ্ডিত হওয়া উচিত।

রবিদাস কাশীর রাজার সমীপে আহূত হইলেন। তিনি অসঙ্কোচে অবিচলিতভাবে আপন মত নিবেদন করিলেন; তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া কাশীরাজ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি দিলেন। অভিমানী ব্রাহ্মণদলের চাতুরী ব্যর্থ হইল।

রবিদাসের খ্যাতি শুনিয়া চিতোরের রাণী ঝালি ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সাধুকে দর্শন করিয়া রাণীর চিত্ত দ্রব হইল এবং তিনি তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। রাণী ঝালি স্বামী ও অনুচরগণসহ তীর্থযাত্রায় কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহচর ব্রাহ্মণগণ রাণীর চিত্তবৈকল্য-দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইলেন এবং মুচি-সন্তান রবিদাসের নিকট তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বারংবার বারণ করিতে লাগিলেন। রাণী তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, তিনি কহিলেন, "যিনি শ্রীহরির শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে নীচ বলিলে অপরাধ হয়। সর্ব্ব শাস্ত্রে উক্ত আছে, হরিভক্ত চণ্ডালও ভুবনপাবন।" ব্রাহ্মণ-অনুচরগণ রাণীর বিরুদ্ধে

রাণার নিকটে অভিযোগ করিলেন। রবিদাস রাণাকে এই একটি-মাত্র বাক্য বলিলেন, "ভগবান্ মানুষের হৃদয় দেখেন, জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।" রাণা রবিদাসের সাধুতায় মুগ্ধ হইলেন। রাণী রবিদাসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রবিদাস তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রভাবে প্রাণমন ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহার নিকট স্পর্শমণি অতিনগণ্য। তিনি বলিতেন,—"তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ? তুমি সুবর্ণ, আমি কঙ্কণ; তুমি জল, আমি তরঙ্গ।" রবিদাসের অমূল্য বাণী ও সঙ্গীত মানবের চিত্তের অন্ধকার ও সংশয় দূর করে। তাঁহার বহু সঙ্গীত (শব্দ) শিখদের ধর্ম্মপুস্তক গ্রন্থসাহেবে স্থান পাইয়াছে।

রামমোহন

একটি শ্লোক আছে, 'গুণিগণের গণনাকালে যাঁহার নামের নিম্নদেশে সম্মানসূচক শুভ্র রেখাপাত হয় না, এমন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া যদি কেহ জননী হইয়া থাকেন, তবে বন্ধ্যা বলা হইবে আর কাহাকে ?' নির্গুণ অধার্ম্মিক ও মূর্খ শত পুত্রের জননীও এইরূপ গণনার সময়ে বন্ধ্যা হইবেন ; আর একমাত্র প্রতিভাশালী পুত্রের জননী পুত্রবতী বলিয়া পূজিতা হইবেন। আমাদের ন্যায় লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমি মাতৃগৌরব লাভ করেন নাই। যে অল্প কয়েকটি সন্তানের জননী বলিয়া তিনি পৃথিবীর গুণিসমাজে মাতৃরূপে পূজা পাইতেছেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের অগ্রণী। এই মহাপুরুষ দেশের অতিদুর্দ্দিনে এক মহা-অন্ধকারময় যুগে বাঙ্গালা দেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার পল্লীসমাজে যাঁহারা থেলো হুঁকায় তামাক টানিয়া, কাঁধে গামছা ঝুলাইয়া, বড়শী দিয়া মাছ ধরিয়া, পূজামণ্ডপের দাওয়ায় ব'সে টিপিয়া, দলাদলির গল্প করিতেন, তাঁহারা এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিটিকে পল্লীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা গগনবিহারী জ্যোতিষ্কের মত এত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে, উহার বিমল আলোক পল্লী ও দেশ অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করিয়াছিল। জননীর গোপনভাণ্ডারের যে মহামূল্য কৌস্তভরত্নের খোঁজখবর দেশবাসীরা বিস্মৃত হইয়া একান্ত দীনহীন হইয়া পড়িয়াছিল,

রামমোহন আপনার অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে জননীর সেই মহা-নিধি বিশ্ববাসীর সম্মুখে ধারণ করিয়া দেশদেশান্তরে মাতৃভূমির গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। পৃথিবীর বিরাট্‌যজ্ঞশালায় তিনি এমন মনোহর অর্ঘ্য লইয়া অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, বিস্মিত বিশ্বজন বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বজননীর পূজকদের জন্য নির্দ্ধারিত আসনগুলির একখানিতে তাঁহাকে মহাসমাদরে বরণ করিয়া লইলেন। তখন বাঙ্গালার অখ্যাত পল্লীবাসী রামমোহন রায় কেবলমাত্র বঙ্গদেশের নহেন, ভারতবর্ষের নহেন, সমগ্র পৃথিবীর মহামানব হইয়া গেলেন। তিনি ভিখারীর ন্যায় রিক্তহস্তে পৃথিবীর পূজাগৃহে গমন করেন নাই, রাজার ন্যায় সম্পদ্ লইয়া তথায় গমন করিয়াছেন এবং মাতৃদত্ত ঐশ্বর্য্য সকলেরই মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। যখন তাঁহার অত্যুচ্চ প্রতিভালোক হইতে শ্রবণ-মঙ্গল স্বরে তিনি সকলকে পূজাগৃহে আহ্বান করিলেন, তখন জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান্ সকলে তথায় সমবেত হইলেন। তিনি যে মন্ত্রে মায়ের বন্দনা, আরাধনা ও উপাসনা করিলেন, তাহা ভারতবর্ষীয় হইলেও সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হইল। বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান সিংহবিক্রমে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মোপাসনার যে বিজয়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন, সেই পবিত্র স্তম্ভমূল সকল দেশের সকল মানবের মহামিলনের ক্ষেত্র হইয়া গেল। ধর্ম্মক্ষেত্রে যে মহামিলন এত দিন কবিদের কল্পনায় বিহার করিত, রাজা রামমোহন বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া এই পতিত বঙ্গদেশে তাহার ক্ষীণ সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। উদার-হৃদয় ধার্ম্মিকগণ তাঁহাকে এই গৌরব দান করিয়া থাকেন এবং আজি হউক, সহস্র বর্ষ পরেই হউক, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে এই গৌরব দান করিবেই। এই প্রতিভাশালী মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী স্বগৃহে এমন একজন মহাত্মাকে লাভ করিল যে, তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে তাহার

দাঁড়াইবার অধিকার হইল। আমরা এখন রামমোহনের "স্বদেশবাসী" বলিয়া বিদেশে গৌরব লাভ করিতে পারি।

তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও জীবন-কাহিনী স্মরণ করিলে হৃদয় স্বভাবতঃ বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। মনে হয়, তিনি অতুলনীয় দৈব সম্পদ্ লইয়াই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি অচল নির্ভর, ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, সর্ব্ব মানবের প্রতি অপ্রমেয় প্রীতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণরাজি বলিয়া উক্ত হইতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর অন্তরের মধ্যে যখন স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত গভীর আন্দোলন চলিতেছিল, ইংলণ্ডে যখন বার্ক্, চ্যাট্হাম্, ফক্স্ প্রভৃতি মনস্বিগণ স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিয়া অগ্নিপ্রসূ বক্তৃতা করিতেছিলেন, যখন মার্কিন্ দেশে, বেঞ্জামিন্, ওয়াসিংটন্ প্রভৃতি মহাত্মারা স্বদেশকল্যাণে আত্মত্যাগ করিতেছিলেন, রুশো ভল্টেয়ারের লেখনী যখন ফরাসী-চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিতেছিল, এমনি সময়ে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের ভাবী মহাপুরুষ সর্ব্বমানবের নিকট আত্মার স্বাধীনতার উদার সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন এই দেশে গভীর নিশীথকাল; ইংরাজশাসন তখনও দেশের সর্ব্বাংশে বদ্ধমূল হয় নাই; পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক তখনও দেশবাসীর চিত্তের অন্ধকার কিছুমাত্র দূর করে নাই। পিতৃপিতামহের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ হারাইয়া তখন ভারতবাসী প্রাণহীন বাহ্যানুষ্ঠানে প্রমত্ত ছিল; বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি শত শত কুসংস্কারে তখন সমাজকে পাপে তাপে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বাঙ্গালীর তখন সাহিত্য ছিল না, ভাষা ছিল না, জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতা কিছুই একরূপ ছিল না। এমনই গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ্ত পাবকশিখার তুল্য রামমোহন বাঙ্গালীর ঘরে দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে জন্মলাভ করিলেন।

তিনি বৈষ্ণব জনকজননীর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অতিশৈশবে গৃহ-দেবতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিয়া, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ভগবৎপ্রীতির প্রথম পরিচয় প্রদান করেন।

এই অদ্ভুত ধীশক্তিসম্পন্ন বালক অতিশৈশবে প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া নবম বর্ষে আরবী ও পারসী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনায় গমন করেন। দুই তিন বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিডের জ্যামিতি, আরিষ্টটলের গ্রন্থ, কোরাণ ও সুফী সাহিত্য পাঠ করেন। এই সময়ে কোরাণের একেশ্বরবাদ তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। অতঃপর দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি কাশীধামে গমন করিয়া তথায় বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র গভীর অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেন। এইখানে হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছিল। দেশব্যাপী প্রাণহীন বাহ্য পূজার প্রতি তিনি আর শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিলেন না; সত্যনিষ্ঠ রামমোহনের মনে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইল। অন্তরের উপলব্ধ সত্য তিনি আর দীর্ঘকাল চাপা দিয়া রাখিতে পারিলেন না; পিতা রামকান্তের সহিত ধর্ম্মমত লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; পুত্রের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া রামকান্ত দুঃখিত হইলেন। পিতার বিরাগ-ভাজন হইয়াও রামমোহন তাঁহার উপলব্ধ সত্য হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি অকুতোভয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী"-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই সময়ে বালক রামমোহনের বয়স ষোল বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। তখন ইংরাজী ভাষার সহিত তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় ছিল না; তিনি আরবী, পারসী ও সংস্কৃত মাত্র জানিতেন। সুতরাং, একথা ধ্রুবসত্য যে, এই বালকের অসামান্য প্রতিভা এই দেশীয় শাস্ত্র-সমুদ্রের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে সত্যরত্ন উদ্ধার

করিয়াছিল। এই ষোড়শ বর্ষ বয়সেই রামমোহন তাঁহার প্রতিভার অমোঘ পরিচয় প্রদান করিলেন।

সত্যের পতাকা যিনি করে ধারণ করিবেন, অসংখ্য অস্ত্রাঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবেই। এই সময়ে পিতা রামকান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামমোহনকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সত্যের নিশান হস্তে করিয়া নির্ভীক রামমোহন ষোল বৎসর বয়সেই গৃহের বাহিরে আসিলেন।

তাঁহার শাপে বর হইল, তিনি পল্লীর বৈঠক ছাড়িয়া রাজপথে আসিয়া উপনীত হইলেন। অনিকেতন বালক ভারতের নানা অংশে ভ্রমণ করিয়া সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা আয়ত্ত করিলেন এবং দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগুরুদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মের বিকৃতি দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইল। ষোড়শবর্ষীয় বাঙ্গালী বালক সত্যান্বেষণের ও স্বাধীনতার প্রবল আকর্ষণে সকল বিপদ্ সকল ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া চিরতুষারাবৃত হিমগিরি লঙ্ঘন করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ও সত্যের প্রতি কি গভীর অনুরাগ তাঁহাকে এই অসাধ্যসাধনে শক্তিদান করিয়াছিল!

ষোড়শবর্ষীয় বালক একাকী সুদূর প্রবাসে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্যানুসন্ধিৎসা এখানেও তাঁহাকে ঘোর বিপদে নিমজ্জিত করিল। তিব্বতীয়েরা লামা-উপাধিধারী এক ব্যক্তিকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। সত্যনিষ্ঠ রামমোহনের ইহা সহ্য হইল না। তিনি নির্ভয়ে এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিলেন। ধর্ম্মান্ধ তিব্বতীয়গণ তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ডবিধানের নিমিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোমল-হৃদয়া তিব্বতবাসিনী নারীগণ তাঁহাকে সেই বিপদে আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে নারী-জাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে।

অতঃপর রামমোহন ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সন্ধানের নিমিত্ত পিতা রামকান্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লোক পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রেরিত লোকের সহিত তিনি চারি বৎসর পরে পুনর্ব্বার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মতদ্বৈধ বিস্মৃত হইয়া স্নেহশীল পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে রামমোহন অখণ্ড মনোযোগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে তিনি অত্যল্পকাল-মধ্যে স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ অতিশয় আশ্চর্য্য ছিল। একদিন প্রভাতে স্নানান্তে তিনি বাল্মীকির রামায়ণ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অধ্যয়নে এমনি নিমগ্ন হইয়াছেন যে, আহারের সময় অতিক্রান্ত হইল; তাঁহার পাঠ চলিতে লাগিল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করেন, তাঁহার ইঙ্গিতে তিনি উপবেশন করিলেন, রামমোহন ধ্যান-নিবিষ্টের ন্যায় পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। একাসনে দিবসের শেষভাগে অনধীতপূর্ব্ব সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিয়া আহার করিতে চলিলেন। পাঠ্য বিষয়ে তিনি তাঁহার মনকে এমনি অনায়াসে নিমগ্ন করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার একাগ্রতা, তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ সকলই বিস্ময়কর। সুপণ্ডিত রামমোহনের ধর্ম্মমত পূর্ব্ববৎ ছিল। তাঁহার পিতা ভ্রমক্রমে মনে করিয়াছিলেন যে, প্রবাসে নানা ক্লেশ পাইয়া হয় তো রামমোহন এমন শান্তশিষ্ট হইয়া থাকিবেন যে, তিনি আর পৈতৃক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। ফলে কিন্তু তাহা হইল না। প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই রামমোহন অসঙ্কোচে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। পুত্রের ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া রামকান্ত দ্বিতীয় বার তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে জননী ফুলঠাকুরাণীও রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "বিধর্ম্মী" পুত্রকে পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে

বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আদালতে পুত্রই জয়লাভ করিলেন; রামমোহনকে কিছুতেই বিধর্ম্মী বলিয়া প্রতিপন্ন করা গেল না। উত্তরকালে তিনি স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমার তর্কেবিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্তনামে যে বিকৃত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।"

পিতৃবিয়োগের পরে আবার রামমোহন স্বগৃহে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অসীম লোকপ্রীতির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দেশের সামাজিক কুপ্রথাগুলি তাঁহাকে প্রতিনিয়ত মর্ম্মাহত করিত। এই সময়ে এক সতীর সহমরণকালের তুমুল আর্ত্তনাদ এবং উক্ত অসহায়া নারীর প্রতি স্বজনদের অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার করুণ-হৃদয় শোকে বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছিল। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রাণপাত করিয়াও এই কুপ্রথা সমূলে উৎপাটন করিবেন। পুরুষসিংহ রামমোহনের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবার নহে। উত্তরকালে মহামতি লর্ড্ বেণ্টিকের আনুকূল্যে সমগ্র দেশবাসীর প্রতিকূলতাসত্ত্বেও তিনি এই প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। শৈশবে যে মহাসত্যের ভাবে রামমোহন আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি জীবনের এক দিনের জন্যেও সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। পূর্ব্ববৎ পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারে তিনি নিযুক্ত রহিলেন। এই জন্য তাঁহার জননীকর্ত্তৃক গৃহ হইতে আবার তাড়িত হইলেন। এইবার তিনি রঘুনাথপুর গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সে রামমোহন ইংরাজী ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেন। প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি এদিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। মোটামুটি কাজচালানগোছ শিখিয়া লইয়াছিলেন। ১৬ বৎসর

কাল তিনি ইংরাজরাজ-সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে অনেক রাজপুরুষ তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ডিগ্‌বি সাহেবের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মে। ডিগ্‌বি সাহেব রংপুরে কালেক্টর্ ছিলেন, রামমোহন তথায় তাঁহার সহকারিরূপে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। অবসরসময়ে এই বন্ধুযুগল ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেন। সুশিক্ষিত ইংরাজদের সহিত মিশিয়া তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে, সাধারণতঃ তাহারা অধিকতর বুদ্ধিমান্ দৃঢ়তাসম্পন্ন ও মিতাচারী। তিনি যে সর্ত্তে ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে কার্য্যগ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা এই মহাপুরুষের মহত্ত্বেরই উপযোগী। লিখিত সর্ত্ত হইয়াছিল যে, তিনি যখন সাহেবের সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে এবং সামান্য আমলার প্রতি যেরূপ হুকুম জারি করা হয়, তাঁহার প্রতি কদাচ তেমন করা হইবে না।

এই চাকরীকালেও তিনি কদাচ তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার চাকরীজীবনের তের বৎসরের দশবৎসরই রংপুরে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সন্ধ্যার পরে স্বগৃহে সভা আহ্বান করিয়া পৌত্তলিকতার অসারতা ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিতেন; বলা বাহুল্য, এখানেও তাঁহাকে প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের মহাব্রত-সাধনে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা, অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা দেহ মন ও ধনসম্পদ্ সমস্তই তিনি দেশ ও সমাজের হিতকল্পে দান করিলেন। সর্ব্বস্ব পণ না করিয়া কি প্রকারে তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিবেন ? তাঁহার প্রতিভা অবলীলাক্রমে দেশের ও বিদেশের আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর সকল সত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিল। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলি কেবল তিনি জানিতেন এমন নহে, ঐ সকল ভাষায় তিনি গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

পুরুষসিংহ রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া দেশব্যাপী কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে বীরবর চারিখানি শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। প্রথম কথোপকথন, দ্বিতীয় তর্কবিতর্ক, তৃতীয় বিদ্যালয়স্থাপন, চতুর্থ সভা-সংস্থাপন। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রচার করিয়া বিতরণ করিলেন। অচিরে এই গ্রন্থের ইংরাজী ও হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রচারিত হইল। অতঃপর বেদান্তসার, বেদান্তপ্রবেশ, উপনিষদ্ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কলিকাতা নগরে ধর্ম্মান্দোলনের তুমুল বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিলেন। পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে শঙ্কর শাস্ত্রী ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী তাঁহার সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে সম্মুখীন হইলেন। রামমোহনের গভীর পাণ্ডিত্য ও অসামান্য উপস্থিত বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তির নিকটে পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য ম্লান হইয়া গেল, তাঁহারা শাস্ত্রযুদ্ধে পরাভূত হইলেন। রামমোহন অকুতোভয়ে প্রচলিত ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া এবং ব্রহ্মোপাসনা সমর্থন করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ প্রচার করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকগণ ক্রোধান্ধ হইয়া নানা প্রকারে রামমোহনের অনিষ্টসাধনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আগমনের পরে রামমোহন তাঁহার মুষ্টিমেয় বন্ধুদের সহিত ধর্ম্মালোচনার নিমিত্ত ১৮৩৫ শকে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করিলেন; এই সভার অধিবেশন তাঁহার মাণিকতলার ভবনেই হইত। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তিনি তাঁহার অনুরাগী বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর,

রায় কালীপ্রসন্ন মুন্সী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি মহাশয়গণের আনুকূল্যে সাধারণের নিমিত্ত উপাসনা-সভা স্থাপন করেন। এই সভাস্থাপনের অল্প দিন পরে সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে রামমোহনের শত সহস্র শত্রু ছিল। তিনি সেই শত্রুব্যূহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কুঠার হস্তে অবিদ্যারণ্য সমভূমি করিয়া দেশ-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাকী নির্ভয়ে সার্ব্বভৌম উপাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিলেন!

মহাপুরুষ রামমোহন যে দেবতার অর্চ্চনা, আরাধনা ও বন্দনার জন্য সকল দেশের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল ধর্ম্মের মানবকে আহ্বান করিলেন, সেই দেবতা কে? তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা, অনাদি অনন্ত। রামমোহন এই সত্যস্বরূপ দেবতাকে যেভাবে অর্চ্চনা করিতে বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—"তোমরা এই পরম দেবতাকে তোমাদের আয়ুর দেহের এবং সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া বন্দনা কর; সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার অপার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক স্মরণ কর। ফলাফলের দাতা ও শুভাশুভের নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর, অর্থাৎ ইহাই অনুভব কর যে, যাহা করিতেছ কহিতেছ ভাবিতেছ, সমস্তই সেই পরম দেবতার সম্মুখেই করিতেছ কহিতেছ ভাবিতেছ। এই দেবতার করুণা-লাভের নিমিত্ত তোমাকে সকলের প্রতি স্নেহ পোষণ করিতে হইবে। যেরূপ ব্যবহার পাইলে তোমার তুষ্টি হয়, সকলের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এই পরম দেবতার উপাসনার জন্য রামমোহন যে মন্দির স্থাপন করিলেন, সেই মন্দিরের দুয়ার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিলেন। যিনি শিষ্ট, যিনি শ্রদ্ধাশীল, তাঁহারই এই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার রহিল। সকল মানবের মহামিলনের এই মন্দিরে কোনো ছবি প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল। পানাহার, নৈবেদ্য, বলিদান,

প্রাণিহিংসা প্রভৃতি এই মন্দিরে কদাচ হইতে পারিবে না। যাহাতে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া ও সাধুত্বার উন্নতি হয়, এবং বিশ্বের স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় এইরূপ উপদেশ বক্তৃতা প্রার্থনা ও সঙ্গীত এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাত্মা রামমোহনের মতে এই ব্রহ্মোপসনার অঙ্গ দুইটি; (১) তুষ্টির উদ্দেশে যত্ন, (২) পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তি। এই উপাসনা কিরূপ-ভাবে করিতে হইবে, তাহা তিনি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন,—"এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ এবং নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপাসনাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এই উপাসনার সাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবে, যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইঁহাদের হইতে যে ক্ষণে ক্ষণে উপকার হইতেছে এবং ব্রীহি যব ওষধি ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল যে পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন এবং যুক্তিদ্বারা সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন ইহা পুনঃপুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব

সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনার সমর্থ হন।" (গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ)। এই উপাসনার প্রণালীর সহিত তদানীন্তন অপর সকল উপাসনাপদ্ধতির দুইটি মৌলিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রামমোহন স্বয়ং বলিয়াছেন,—"তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমত, তাঁহারা পৃথক পৃথক অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয়বোধে উপাসনা করেন। কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য—ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়ত, এক প্রকার অবয়ব-বিশিষ্টের যে উপাসক তাহার সহিত অন্যপ্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভাবনা নাই।" (গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ)

বিচারের দিক দিয়া কেহই এই উপাসনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। রামমোহন যে দেবতাকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করিতে বলিলেন, কে তাঁহাকে অস্বীকার করিবেন? পৃথিবীর যে-কোনো সম্প্রদায় আপনার উপাস্য দেবতাকে যে-কোনো নামেই অভিহিত করুন না কেন, সেই দেবতাকেই জগৎকারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? রামমোহনের উদার ধর্ম্ম ও অগাধ পাণ্ডিত্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে এমন প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিতে লাগিল যে, কি হিন্দু, কি খৃষ্টান কোনো সম্প্রদায়ই তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। রামমোহন চারিদিক হইতেই নিন্দা, গালি, প্রতিবাদ শুনিতে পাইতেন। যে দেশবাসীর কল্যাণকামনায় তিনি আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতেছিল! খৃষ্টান্ পাদ্রী ও গোঁড়া হিন্দু এই দুই দলই তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত বৈধ

ও অবৈধ প্রণালী অবলম্বন করিল। তাহারা ছড়া বাঁধিয়া, পুস্তক ছাপিয়া, ধর্ম্মসভা বসাইয়া রামমোহনকে দমন করিতে চেষ্টা পাইল। খৃষ্টানেরা রামমোহনকে তাহাদের ছাপাখানায় পুস্তক ছাপাইতে দিতে অস্বীকৃত হইল। সহস্র সহস্র ব্যক্তির এইরূপ অজস্র বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ সত্যপ্রতিষ্ঠ রামমোহনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। যে বাঙ্গালী তাঁহাকে পদে পদে নির্য্যাতন করিলেন, সেই অজ্ঞান তিমিরান্ধদেশ-বাসীকে তিনি অন্ধকারকূপের মধ্য হইতে টানিয়া তুলিয়া পৃথিবীর সভায় উপস্থিত করিলেন। এক্ষণে দেশের মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিল্প বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে আন্দোলন চলিতেছে, তিনি সেই সকলেরই সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই গদ্য রচনা বাংলা ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনা। তাঁহারই যত্নে এদেশে ইংরাজিশিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের মঙ্গলহস্ত সকল শুভ প্রচেষ্টার মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কি ঘোর সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তদ্ভিন্ন তিনি কন্যাপণ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি সকল সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি এদেশবাসীর অধিকার-প্রসার ও রাজাপ্রজার মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। রামমোহন বলিয়াছেন, ইউরোপীয় প্রণালীতে স্বদেশজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক। তিনি বলেন, একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পদেই অধিকারী হইলে দেশের উপকার হইবে। প্রজারা জমিদারকে যে খাজনা দিবে তাহা চিরদিনের জন্য স্থির হওয়া উচিত। বিচারের সুবিধার নিমিত্ত ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকগণ পরস্পর স্বাধীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজনীতিক্ষেত্রে এপর্য্যন্ত যত কথা আলোচিত হইয়াছে,

রাজা সে সকল কথা সেই শতাব্দীপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রে তিনি এই বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বর্ত্তমান যুগকে "রামমোহনের যুগ" বলা হইয়া থাকে।

স্বদেশপ্রেমিক রামমোহন স্বদেশবাসীর কল্যাণকামনায়ই ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন বহুবর্ষের জন্য স্থিরীকৃত হইবার কথা চলিতেছিল। তখন পার্লামেণ্ট্ হইতে নির্ব্বাচিত এক কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দের পক্ষ হইতে রামমোহন ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তদ্ভিন্ন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে, ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করার জন্য তিনি রামমোহনকে "রাজা" উপাধি দিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের গুণিসমাজ অতি-অল্পদিনের মধ্যে, এই মহাত্মার গুণে, মাহাত্ম্যে, সৌজন্যে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ললাটে বিজয়তিলক পরাইয়া-দিলেন। রাজার অমায়িকতায় ইংলণ্ডের পরিচিত বালকবৃদ্ধ নরনারী সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখানে তিনি স্বদেশের কল্যাণের জন্য রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করেন। তথায় প্রকাশ্য সভায় তিনি সমাদৃত হন। ওয়েষ্ট্‌মিনৃষ্টার্ পত্রের সম্পাদক বাউরিং বক্তৃতাকালে বলেন,—"যদি প্লেটো বা সক্রেটিস্, মিল্টন্ বা নিউটন্ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, সেইরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছি।" ইংলণ্ড্ ও ফ্রান্স্ এই মহাত্মাকে মহাপুরুষের আসনে স্থাপন করিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিল। সমগ্র পৃথিবীর বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার প্রতিভায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বদেশের এই জ্যোতিষ্ক পশ্চিমদেশে গমন করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। জীবন ও মৃত্যু দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে

আপনার জীবনের যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিলেন। পবিত্র ওঁকার-ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণশিখা বরণীয় দেবতার তেজের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

আমরা কেমন করিয়া এই মহাপুরুষের অদ্ভুত চরিত্রের গুণকীর্ত্তন করিব? আমরা তেমন মানবপ্রেম আর কোথায় পাইব, যে প্রেম সর্ব্ব দেশকে সর্ব্ব জাতিকে স্বাধীন দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত? স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়া ফরাসী রণতরী আসিতেছে—রামমোহন সেই তরীকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল! স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল—রামমোহন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া টাউন্‌হলে ভোজ দিলেন। নেপ্‌ল্‌স্ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, মনোবেদনায় রামমোহন শয্যাশায়ী হইলেন; তিনি আর বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিতে পারিলেন না। এমন বিশ্বপ্রেম আমরা আর কোথায় দেখিব?

নারীজাতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখাইতে তিনি যেমন জানিতেন, আর কে তেমন জানেন? মিসেস্ ডেভিসন্ নামক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলা বিস্ময়ের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন,—"রাজা আমাকে এমন পরমেশ্বরে গাঢ় শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন যে, রাজরাণী হইলেও অন্য কেহ তেমন শ্রদ্ধা দেখাইতে পারিবেন না।"

দরিদ্রের প্রতি রামমোহনের অসামান্য করুণা ছিল। একদিন শুনিলেন, তাঁহার পুত্র বাজারের দোকানীদের নিকট হইতে তোলা তুলিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"এই সকল দুঃখী লোক সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে, ইহাদের উপর অত্যাচার!"

একদিকে তাঁহার জীবের প্রতি অসীম প্রেম, অন্যদিকে তাঁহার অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, পুঞ্জীভূত বিপদ্‌রাশির মধ্যে অসীম ধৈর্য্যসহকারে

কর্ত্তব্যসাধন, অকুতোভয়ে সত্যপ্রচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই উভয়ের সংমিশ্রণ তাঁহার চরিত্রকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দান করিয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি এমন মহত্ত্বব্যঞ্জক ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই মন উদার হইত। তিনি জীবনের প্রথম-অবধি শেষপর্য্যন্ত সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে তেজোবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমনকালে পুত্রের চক্ষে জল দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন,—"পুরুষবাচ্ছা, কাঁদ কেন?" রামমোহনের চরিত্র চিরকাল অলৌকিক পৌরুষের দ্বারা ভূষিত ছিল।

হে মহাপুরুষ, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা দেখাইবার অধিকার এখনো আমাদের জন্মে নাই। দেশের অধিকাংশ লোকেই এখনো তোমাকে ধর্ম্ম-দ্রোহী সমাজ-দ্রোহী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে। হে শ্রেষ্ঠ, হে নমস্য, তুমি যাহা যাহা আচরণ করিয়া গিয়াছ, আমরা এখনো সেই সমুদায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারি নাই। হে মহাপুরুষ, তুমি আর একবার আমাদের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হও। আমাদের জীবনস্রোত বদ্ধজলাশয়ের মত গতিহীন হইয়া আছে, তুমি এই স্রোত বহাইয়া দাও। আমরা কপটাচারে ও জাতীয় অভিমানে অন্ধ হইয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করি না, পতিতকে স্পর্শ করিতে আমরা ঘৃণা বোধ করি, অথচ ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া থাকি; তুমি আসিয়া আমাদিগকে সার্ব্বভৌম লোকপ্রীতি শিক্ষা দিয়া এই অসত্য হইতে রক্ষা কর। পরনিন্দায় পরকুৎসায় পরপীড়নে আমাদের উল্লাস। আমরা প্রত্যহ পাপাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছি; হে মহাপ্রাণ, তুমি তোমার উদার ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আমাদিগকে এই পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া তোল। আমরা বিনীতভাবে বারংবার তোমাকে নমস্কার করি; আর নমস্কার সেই বিশ্বব্যাপী পরম দেবতাকে, যাঁহার বিজয়পতাকা সগৌরবে ও সবিক্রমে তুমি আমরণ বহন করিয়াছ। তাঁহারই পুণ্যনাম জয়যুক্ত হউক।

গ্রন্থকার প্রণীত

শিখগুরু ও শিখজাতি

সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

মডারন্ রিভিউ বলেন—

The book is admirably planned and is not marred by preconceived notions. It is happily free from all bias—especially is it not disfigured by that anti-foreign feeling to which some enthusiastic latter day authors are prone when they speak of the Maratha and the Sikh community in the days of their glorious independence. This is the sheer blindness of a certain section of our public men; they want the European spirit in every department of thought and action and yet are perversely railing against that very influence which is required to shape and mould our social polity.

All the leading Sikh Gurus have been distinctly sketched. The language is quite modern, is simple and chaste, is not at all spotted with Sanscritist phraseology and the narrative flows on unimpeded by prejudice or predilection.

The introduction is the chief feature. * * * *. The rise, growth and fall of the Sikh power have been traced with a master's hand and the real causes of its decay have been analysed with unsurpassable skill. The main point on which Babu Rabindra Nath has laid great stress is the fact that the religious teachings

of the first Gurus should not have been allowed to be diverted to earthlier political purposes, the spark of spiritual fervour should not have been used in igniting the faggots of military enthusiasm whose intense glows certainly spread over the particular community for a while but left the rest of the country untouched, unmoved, unquickned, left it, as it was before, buried in sloth, selfishness and frigid indifference. The Sikh reformers made a huge mistake when they turned the spirit's current into the degraded channels of martial ambition and renown; the stream which broke forth and issued from the snow-clad heights and sweetened the lives of men became choked amidst the base sands.

All sincere students of literature must welcome such works. They indicate that the historic spirit, the historic attitude, the historic vision which Indian writers never possessed before has been born.

ভারতী বলেন—

গ্রন্থের ভাষা সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে এমন উপযোগী ইতিহাসগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অল্পই আছে। ইহা শুধু ইতিহাসের কঙ্কাল নহে, লেখকের সহৃদয়তাগুণে বর্ণিত বিষয়গুলি যেন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসগ্রন্থ রচনায় শরৎবাবু নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বেশ একটি ধারাবাহিকতা আছে। ইহার অংশগুলি স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাই তাঁহার ইতিহাসগ্রন্থের বিশেষত্ব। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আরো উপাদেয় হইয়াছে, গ্রন্থের প্রারম্ভে রবীন্দ্র বাবুর ভূমিকা-সমাবেশে। সুচিন্তিত ভূমিকাখানি পাঠ করিলে ইতিহাস কাহাকে বলে তাহার বিশদ আভাস

পাওয়া যায়। শিখ ও মারাঠাজাতির উত্থান-পতনের কারণ নির্দ্দেশ, ভারতীয় আদর্শের স্বাতন্ত্র্যনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি কবিবরের ভূমিকায় বেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন জ্ঞানগভীর রচনা বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, সের সিংহ, রণজিৎ সিংহ, খড়্গ সিংহ, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির প্রভৃতি বহু চিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন—

বাঙ্গালা দেশে ইতিহাস সাহিত্য যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে আমাদের বিচিত্র জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধমূলক ইতিহাস প্রণয়ন অসম্ভব মনে করি। এখন বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের জন্য বিদেশীয় ঐতিহাসিকপ্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী হইতে প্রধান প্রধান তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই আমাদের অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ হইতে পারে। আপনার ইতিহাস রচনাকার্য্যে আমাদের এই অভাব যে পূরণ হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; যে সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে ইতিহাসাদি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের কর্তৃপক্ষেরা এবং শিক্ষানুরাগী অভিভাবকগণ আপনার পুস্তক সাদরে ব্যবহার করিবেন—এইরূপ আমার বিশ্বাস।

আপনার পুস্তকে ঐতিহাসিকোচিত সংযম ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতার অভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার প্রয়াসে বাঙ্গালা সাহিত্য একখানি বাক্যাড়ম্বরশূন্য তথ্যপূর্ণ ও ধারাবাহিক ইতিহাসগ্রন্থ লাভ করিল। শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহা শিক্ষাপ্রদ হইবে।

শিবাজী ও মারাঠাজাতি

সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

ভারতী বলেন—

সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের দৃষ্টি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লেখক প্রায়ই ইতিহাসের বাহ্য বস্তু, রক্ত মাংস লইয়াই ব্যস্ত; অধিকাংশ গ্রন্থ তাই খ্রীষ্টাব্দে, যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, ঐতিহাসিক ঘটনা বা তারিখের কোন মূল্য নাই। ঐতিহাসিক তথ্যের মূল্য যথেষ্ট, কারণ ঐ সকল ঘটনার অন্তরালে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহার রহস্য ভেদ না হইলে আমরা ইতিহাসের আভ্যন্তরীণ প্রাণটুকুর সন্ধান পাই না। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রাণাডে লিখিত Rise of the Mahratta Power ও কাপ্তেন গ্রাণ্টডফের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত। কিরূপে একটি জাতি গঠিত হয়, কোন্ কোন্ শক্তি ও ঘটনা দ্বারা তাহার অভ্যুত্থান ও পতন হয়, কিরূপে একটা জাতির ব্যবস্থাবিধি, আচারব্যবহারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন প্রবাহিত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী, অধিকার বিধি প্রবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হয়, ইহাই ইতিহাসের কঙ্কাল (constitutional history); মারাঠাগণ কিরূপে সহসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল,—কিরূপে বিভিন্ন দলগুলি সম্মিলিত হইল, কিরূপে শিবাজী মারাঠাদিগের এই অভ্যুদয়ে আপনার ঐশীশক্তি নিয়োজিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিলেন; নিরক্ষর শিবাজীর প্রতিভা কোন্ কোন্ উপায়ে প্রকৃষ্ট প্রকাশের পথ পাইল;—বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার

করিয়া, খণ্ডিত অংশগুলিকে সংযোজিত করিয়া কিরূপে এক সমগ্র জাতি গঠন করিল, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লইয়া শরৎবাবু গ্রন্থখানিকে নীরস করিয়া তোলেন নাই। ঐতিহাসিক তথ্যেরও যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন; আফজলখাঁর হত্যা বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি শিবাজী চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনে সফল হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটি উপাদেয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া মারাঠা ইতিহাসের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যবিভাগে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যথেষ্ট আদরের সামগ্রী। ভরসা করি, সাধারণ্যে ইহার বিশেষ সমাদর হইবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম এ, মহোদয় লিখিয়াছেন:—

'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' পড়িলাম। আপনার প্রয়াস প্রশংসনীয়। আপনি শুধু ঘটনা বিন্যাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মারাঠা ইতিহাসের উপদেশগুলি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মারাঠাজাতি কিরূপে বড় হইল, কেন তাহাদের পতন হইল, নেতাদের চরিত্র ও শাসনপ্রণালী এবং তাহার ফল, জাতির উপর দেশের ভৌগোলিক অবস্থার ও অতীতের প্রভাব,—এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আপনার বইখানিকে পূর্ণাঙ্গ ও উপদেশপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। বইখানি ছোট বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহাকে শিক্ষায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথমে ছেলেদিগকে এই বই হইতে মারাঠা ইতিহাস মোটামুটি শিখাইয়া, পরে অন্য বড় গ্রন্থ হইতে গল্প ও

বর্ণনা শুনাইয়া ছাত্রদের জ্ঞান সহজেই বিস্তীর্ণ এবং পুস্তিকার উপদেশ আরও গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রবাসী বলেন—

বহু জ্ঞাতব্য নূতন তথ্য ইহাতে পাওয়া যাইবে। মহাত্মা শিবাজীর মহৎ চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। ইহাতে শিবাজীর রাজত্ব, তাঁহার বংশধরদিগের বৃত্তান্ত ও পেশোয়াদিগের শাসন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে একটি দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত একটি নেশন সংগঠনের চেষ্টার ইতিহাস পাওয়া যাইবে। দেশের রাষ্ট্রশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করে তাহাই প্রকৃত নেশনের ইতিহাস, তাহার সূত্রপাত মারাঠারাই করিয়াছেন। এই শুভপ্রচেষ্টা কেন নিষ্ফল হইল তাহারও কারণ এই পুস্তকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা থাকাতে। তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন, জাতীয় ইতিহাস কাহাকে বলে, কি অবস্থায় নেশন গঠিত হয়, মারাঠাজাতির বিশেষত্ব কোথায় এবং তাহাদের সহিত শিবাজীর কি সম্পর্ক। এই গ্রন্থ বালকদিগের গৃহপাঠ্য করা উচিত। অভিভাবকগণ বিবেচনা করিবেন, কারণ বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠনা ত উঠিয়া গেল, যাহা বা হইবে তাহা বিদেশীয় ইতিহাস, বিলাস অত্যাচারের ইতিবৃত্ত, আমাদের জাতীয় কথার স্থান তাহাতে নাই। সম্প্রতি কতকগুলি ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হইল। ইহা অতি সুলক্ষণ। এক্ষণে পাঠক সাধারণ ইহার সমাদর করিলেই মঙ্গল। সমালোচ্য গ্রন্থের ছাপা কাগজ পরিষ্কার।